নজরুল ইসলাম

পরিবেশক :

মৃত্যু-ক্ষুধা

(১)

পুতুল-খেলার কৃষ্ণনগর।

যেন কোন খেয়ালি শিশুর খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।

খোকার চ'লে-যাওয়া পথের পানে জননীর মত চেয়ে আছে—খোকার খেলার পুতুল সাম্‌নে নিয়ে!

এরই একটেরে চাঁদ-সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মত ক'রে গাছপালার আড়াল টেনে রাখা।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান আর 'ওমান কাত্‌লি' (রোম্যান্‌ ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশী কন্‌ভার্ট ক্রীশ্চানে মিলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকে এই পাড়ায়।

এরা যে খুব সদ্ভাবে বসবাস করে এমন নয়। হিন্দুও দু-চার ঘর

আছে—চানাচুর ভাজায় ঝাল্‌ছিটের মত। তবে তাদেরও আভিজাত্য-গৌরব ওখানকার মুসলমান-ক্রীশ্চান—কারুরই চাইতে কম নয়।

একই-প্রভুর-পোষা বেড়াল আর কুকুর যেমন দায়ে প'ড়ে এ ওকে সহ্য করে—এরাও যেন তেম্‌নি। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোমুরায় যথেষ্ট, অথচ বেশ মোটা রকমের ঝগড়া করবার মত উৎসাহ বা অবসর নেই বেচারাদের জীবনে!

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এদের পুরুষরা জনমজুর খাটে—অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চ্চিগিরি বা ঐ রকমের কোনো-একটা-কিছু করে। আর, মেয়েরা বাড়ীতে ধান ভানে, ঘরগেরস্থালির কাজকর্ম্ম করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখধান্দা ক'রে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা করে।

বিধাতা যেন দয়া ক'রেই এদের জীবনে দুঃখকে বড় ক'রে দেখবার অবকাশ দেননি। তা হ'লে হয়ত মস্তবড় একটা অঘটন ঘটত!

এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম! অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই! আমদানি হ'তে যতক্ষণ, রপ্তানি হ'তেও ততক্ষণ!

মাথার-ওপরে টেরির মত এদের মাঝে দু-চার জন "ভদ্দর-লুক"ও আছেন। কিন্তু এতে তাদের সৌষ্ঠব বাড়লেও গৌরব বাড়েনি। ঐটেই যেন ওদের দুঃখকে বেশি উপহাস করে।

বিধাতার দেওয়া ছেলেমেয়ে এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পান্তা ভাত খেয়ে মজুরিতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড় ছেলেটাকে বেশ ক'রে দু-ঘা ঠেঙায়, মেজোটাকে সম্বন্ধের বাচ্‌বিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজঞ্চুস্‌, ছোটটাকে খায় চুমো, তারপর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—রোদে-পোড়া, ধূলিমলিন, ক্ষুধার্ত্ত, গায়ে জামা নেই। অকারণ ঘু'রে বেড়ায়, কাঠ কুড়োয়, সুতোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছোটে এবং সেই সঙ্গে খাটি বাঙ্‌লা ভাষার চর্চ্চা করে।

এরাই থাকে চাঁদসড়কের চাঁদবাজার আলো ক'রে! ...এই চাঁদসড়কেরই একটা কলতলায় জল-নেওয়া নিয়ে সেদিন মেয়েদের মধ্যে একটা ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল।

কে একজন ক্রীশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন্ এক মুসলমান মেয়ের কলসী ছুঁয়ে দিয়েছে! এদের দুই জাতই হয়ত একদিন এক জাতিই ছিল—কেউ হয়েছে মুসলমান, কেউ ক্রীশ্চান। আর এককালে এক জাতি ছিল ব'লেই এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে। এই দুই জাতের দুইটি মেয়েই কম বয়েসী এবং তাদের বন্ধুত্বও পাকা রকমের। কাজেই ঝগড়া ঐ মেয়ে দু'টি করেনি। করছে তারা—যারা এই অনাছিষ্টি দেখেছে।

গজালের মা'র পাড়াতে কুঁদুলী ব'লে বেশ নামডাক আছে। সে-ই 'অপোজিশন লীড্' করছে মুসলমান তরফ থেকে।

অপরপক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মা'র মত ক্ষুরধার না হ'লেও তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না। —একেবারে সেকালের ভীম-কান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতই!

গজালের মা গজালের মতই সরু—হাড্ডি-চামড়া সার, কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতই নির্ম্মম হ'য়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হ'য়ে যায়, ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মা'র কটূক্তির জ্বালা তেমনি কিছুতেই আর মিটতে চায় না।

ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌চে, "হারাম-খোর খেরেস্তান কোথাকার! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শূয়োরের মত চর্ব্বি হয়েছে, না লা?"

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসীটা খং ক'রে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মত মুখ বিকৃত ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "তা বল্‌বি বই কি লা স্যুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ীর হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেক্‌নাই বেড়েছে কি না!"

গজালের মা রাগের চোটে তার ভরা কলসীর সব জলটা মাটিতে ঢেলে ফেলে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, "ওলো আগ্-ধুম্‌সী! (রাগ-ধুম্‌সী) ওলো ভগলপুরে গাই! ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল—জজ সায়েবের লো, ইংরেজের!"

পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি! বলি, অ গজালের মা! ঐ জজ-সায়েবও আমাদেরই জাত। আমরা 'আজার' (রাজার) জাত, জানিস?

দু-তিনটি ক্রীশ্চান মেয়ে পুঁটের মার এই মোক্ষম যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে খুশি হয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "আচ্ছা বলেছিস্ মাসী!"

খাতুনের মা কাঁখে কল্‌সী, পেটে পিলে, আর কাঁধে ছেলে নিয়ে

এতক্ষণ শোনার দলে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মাঝে মাঝে মূলগায়েনের দোয়ারকি করার মত গজালের মার সুরে সুর মিলিয়ে দু-একটা টিপ্পনি কাটছিল। কিন্তু এইবার আর তার সইল না। ছেলে পিলে আর কলসী-সমেত সে একেবারে মূলগায়েনের গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়াল, এবং খ্রীশ্চানদের বৌদের লক্ষ্য ক'রে যে ভাষা প্রয়োগ করল, তা লেখা ত যায়ই না, শোনাও যায় না।

এইবার হিড়িম্বা ফস্ ক'রে তার চুল খুলে দিয়ে একেবারে 'এলোকেশী বামা' হয়ে দাঁড়াল, এবং কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে খাতুনের মার মুখের সামনে হাত দুটো বার কয়েক বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে ব'লে উঠল, "তুই আবার কে লো উঝ্‌ড়োখাগী! তবু যদি ভাতারের ধুম্‌সুনি না খেতিস দু'বেলা!" তারপর তার অপ-ভাষাটার উত্তর তার চেয়েও অপভাষায় দিয়ে সে গজালের মার পানে চেয়ে বল্‌লে, "হা লা ভাতারপুত্‌খাগী! তিন বেটাখাগী! তোর ছেলে না হয় জজ সায়েবের বাবুর্চ্চিগিরি কর্‌ত, আর সে ছেলেকেও ত দিয়েছিস্ কবরে! আর তুই নিজে যে সেদিন আমফেসাদ বাবুর (রামপ্রসাদ বাবুর) হাঁড়ি ঠেলে ক্ষুন (উনুন) কেড়ে এলি! ঐ আমফেসাদ বাবু তোদের মৌলবী সায়েব না কি লা? হাত শোঁক্, এখনো খেরেস্তানের গন্ধ পাবি!"

এর চরম উত্তর দিল গজালের মা, বেশ একটু ছুরির মত ধারালো হাসি হেসে, "বলি, ওলো ছুত্‌মোচোখী, ঐ 'আমফেসাদ' বাবু ত আমার তলপেটে চালের পোঁট্‌লা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়েনি! ছেলের বেয়ারাম হয়েলো (হয়েছিল), তাই ওর বাড়ী চাক্‌রী কর্‌তে গিয়েলাম,

(গিয়েছিলাম), তাই ব'লে এক গেলাস পানি খেয়েছি ও বাড়ীতে? বলুক্ দেখি কোন্ কড়ুই-রাঁড়ি বল্‌বে!"

শেষের কথাগুলো হিড়িম্বার কানে যায়নি। সে 'ছিটেন পাড়ার' (প্রোটেস্টাণ্ট্ পাড়ার) পাদ্‌রী সায়েব মিস্টার রামপ্রসাদ হাতীর বাড়ী চাক্‌রি করতে গিয়ে সত্যিই একবার চা'ল চুরির জন্য মার খেয়েছিল। কিন্তু সে কেলেঙ্কারীর কথাটা এতগুলো মেয়ের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেওয়াতে সে এইবার যা কাণ্ড করতে লাগল—তা অবর্ণনীয়! চুল ছিঁড়ে, আঙুল মট্‌কে, চেঁচিয়ে, কেঁদে, নেচে, কুঁ'দে সে যেন একটা বিরাট ভূমিকম্পের সৃষ্টি ক'রে ফেল্‌লে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে গালির বিগলিত ধারা—অনর্গল গৈরিকস্রাব!

যত গালি তার জানা ছিল ভব্য অভব্য শ্লীল অশ্লীল, সবগুলো একবার, দু'বার, বারবার আবৃত্তি ক'রেও তার যেন আর খেদ মেটে না!

'লুইস্-গানার' যেন মিনিটে সাতশ' ক'রে গুলি ছুঁড়্‌ছে!

ছেলেমেয়ের ভিড় জ'মে গেল! ঝগড়া ত নয়, মোরগ-লড়াই!

ওরই মধ্যে একটা গয়লাদের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—"ওরে পচা রে, উই শালা পচা! ছুটে আয় রে ছুটে আয়! তোর দিদিমা 'মা-কালী' হয়ে গিয়েছে!"

এই কুড়ুম-তাল ঝগড়ার মধ্যেও কয়েকটা বৌ-ঝি হেসে ফেল্‌লে!

মুসলমান তরফের একটি বৌ আর থাকতে না পেরে ঘোমটার ভিতর থেকেই ব'লে উঠল, "হাতে একখানা খাঁড়া দিলেই হয়!"

তার চেয়েও সুরসিকা একটি আধ-বয়েসী মেয়ে পিছন থেকে ব'লে উঠল, "কাপড়টাও খুলে পড়্‌তে আর বাকি নেই লো!"

মুসলমান ছেলেমেয়েরা যত না হাসে, তত চেঁচায়!

ক্রীশ্চান ছেলেরা ছোঁড়ে ধূলো।

বেধে যায় একটা কুরুক্ষেত্তর!....

কিন্তু দুঃখের ইন্দ্রপ্রস্থ নিয়ে এ কুরুক্ষেত্র ওখানকার নিত্যঘটনা—একেবারে 'মাছভাত'!

ঝগড়া হ'তেও যতক্ষণ—ভুলতেও ততক্ষণ।

দুঃখ অভাব হয়ত এদের মঙ্গলই করেছে। এত দুঃখ যদি এদের না থাকৃত, তাহ'লে এমন প্রচণ্ড ঝগড়ার পরের দিনই আবার 'দিদি' 'বুবু' 'মাসী' 'খালা' ব'লে হেসে কথা কইতে ওদের বাধ্‌ত!

এরা সব ভোলে—ভোলে না কেবল তাদের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত অভাব!.

এই না-ভোলা দুঃখের পাথারে এরা যেন চর-ভাঙা-গাছের শাখা ধ'রে ভেসে চলেছে। দুঃখের যন্ত্রণায় মন থাকে এদের তিক্ত হয়ে, ভাষাও বেরোয় তাই কটু হয়েই, কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখে—সে একা অসহায়, ভাসছে অকূল-পাথারে, তখন সে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়—যাকে সে এতক্ষণ ধ'রে অতিবড় কটূক্তি করেছে।

তাদের এ জলের জীবন-যাত্রায় কি ডাঙার সুখী মানুষের মত পরম নিশ্চিন্ত মনে বৎসরের পর বৎসর ধ'রে এ ওর পানে মুখ ফিরিয়ে ব'সে থাকবার উপায় আছে?

এ দুঃখের বোঝা যদি এদের এত বিপুল না হয়ে উঠত, তাহ'লে এরাও এতদিন ভদ্রলোকের মত মানুষ জাতির মহাশত্রু হ'য়ে দাঁড়াত—বড় বড় যুদ্ধ বাধিয়ে দিত!

———

(২)

গজালের মার ছোটছেলে প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটারদলে নাচে, সখী সাজে, গান করে। কাজও করে—রাজমিস্তিরির কাজ।

বাবু-ঘেঁষা হয়ে সেও একটু বাবু-গোছ হয়ে গেছে। টেড়ি কাটে, 'ছিক্‌রেট' টানে, পান খায়, চা খায়। পাড়ার মেয়ে মহলে তার মস্ত নাম। বলে—"যেমন গলা, তেমনি গান, তেম্‌নি সৌখিন! 'ঠিয়েটরে' লাচে—বাবুদের ঠিয়েটরে, ঐ খেরেস্তান পাড়ার যাত্তার গানে লয়! হুঁ হুঁ!"

সে যখন 'ফুট-গজ' 'কন্নিক্' আর 'সুত' নিয়ে 'ছিক্‌রেট' টানতে টানতে কাজে যায় আর যেতে যেতে গান ধরে, তখন পাড়ার বৌ-ঝিরা ঘোম্‌টা বেশ একটু তুলেই তার দিকে চায়। 'ভাবী' (বৌদি) সম্পর্কের কেউ হয়ত একটু হাসেও। আর অবিবাহিতা মেয়ের মায়েরা আল্লা মিঞাকে জোড়া মোরগের গোশ্‌তের লোভ দেখিয়ে বলে, "হেই আল্লাজি, আমার কুড়ুনীর সাথেই ওর জোড়া লিখো।"

ঘরে সেদিন চা ছিল না। তাই প্যাঁকালে নেদের পাড়ার বাবুদের বৈঠকখানা হ'তে একটু চায়ের প্রসাদ পেয়ে এসে কাউকে কিছু না বলেই কন্নিক নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়্‌বার জোগাড় করছিল।

তার মা একটু অনুনয়ের স্বরেই বল্‌লে, 'হ্যাঁ রে, তুই যে কাজে যাচ্ছিস্ বড়? এদিকে যে পাঁচি আমার মরে! দেখ্ না একটু কাঠুরে পাড়ার দাই মাগীকে। কাল আত্তির (রাত্তির) থেকে কষ্ট খাচ্ছে, এখনো ত কিছু হ'ল না।"

প্যাঁকালে তখন কম্বিক ফুটগজ সামনে রেখে থালায় একথালা জল নিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে তার তেল-চিটে চু'লে বেশ ক'রে বাগিয়ে টেড়ি কাটছিল! আয়নার অভাব সে কিছুদিন থেকে থালার জলেই মিটিয়ে আস্‌ছে।

চার আনা দামের একটি আয়না সে কিনেও ফেলেছিল একবার কিন্তু একদিন চা খাওয়ার পয়সা না থাকাতে সেটা দু'পয়সায় বিক্রি করে দোকানে চা খেয়ে এসেছে। এখন যা পায়, তাতে চা'লই জোটে না দুবেলা, তা আয়না কিনবে কি!

কিছুদিন থেকে সে রোজই তার রোজের পয়সা থেকে চার আনা আলাদা করে রাখে, আর মনে করে আজ একটা আয়না কিনবেই। কিন্তু যেই বাড়ীতে এসে বাজার করতে গিয়ে দেখে, ছ'আনায় সকলের উপযোগী চাল'ই হয় না, তখন লুকানো সিকিটাও বের করতে হয় কোঁচড় থেকে।

বয়স তার এই আঠার-উনিশ। কাজেই চেয়ে না পাওয়ার দুঃখটা ভুলতে আজো তার বেশ একটু সময় লাগে। কিন্তু তার আয়নার জন্য তার পিতৃহীন ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝিগুলি ক্ষুধিত থাক্‌বে—এ যখন মনে হয়, তখন তার নিজের অভাব আর অভাবই বোধ হয় না।

মৃত্যু-ক্ষুধা

সেদিন ঝগড়ার ঝোঁকে হিড়িম্বা সব চেয়ে ব্যথা দেওয়া গাল তার মা-কে যেটা দিয়েছিল, সে-ঐ 'তিনবেটাখাগী'। সত্যিই ত পাহাড়ের মত জোয়ান তিন ভাই-ই তার মার চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে ম'রে গেল! তার ওপর আবার সবারই দু-চারটে ক'রে ছেলেমেয়ে আছে; এবং তারা সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় এক ডজন।

এই শিশুদের এবং তার বিধবা ভ্রাতৃজায়াদের বোঝা বইবার দায়িত্ব একা তারই। কিন্তু বোঝা তাকে একা বইতে হয় না। তার মা এবং ভ্রাতৃজায়ারা মিলে ও-বোঝা হাল্‌কা করবার জন্য দিবারাত্তির খেটে মরে। ওতে বোঝা হাল্‌কা হয়ত একটু হয়, কিন্তু ক্লান্তি কমে না। ওরা যেন মস্ত একটা খাড়া পাহাড়ের গড়ানে 'খাদ' বেয়ে চলেছে, মাথায় এঁটে দেওয়া বিপুল বোঝা, একটু থাম্‌লেই বোঝা-সমেত হুড়মুড় ক'রে পড়বে কোন্ এক অন্ধকার গর্ত্তে।

গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া! কিছুদিন থেকে আবার ওর ছোট বোনটাও এসে ওদেরই ঘাড়ে চড়েছে! বিয়ে দিয়েছিল ওর ভাল বর-ঘর দেখেই। কিন্তু কপালে সুখ লেখা না থাকলে সে কপাল পাথরে ঠুকেও লাভ নেই! ওতে কপাল যথেষ্টই ফোলে, কিন্তু ভাগ্য একটুও ফোলে না। —পাঁচির স্বামী নাকি কোন্ এক ক্যাওরার মেয়েকে মুসলমান ক'রে নেকা করেছে। কিন্তু তার স্বামীর অর্দ্ধেক রাজত্বে পাঁচির মন উঠল না। একদিন তার অনাগত শিশুর শুভ সংবাদসহ অর্দ্ধেক রাজত্বের সর্ব্বস্বত্ব ত্যাগ ক'রে মায়ের দুঃখের কোলেই সে ফিরে এল।

অভাবের দিনে প্রিয় অতিথি আসার মত পীড়াদায়ক বুঝি আর কিছু নেই! শুধু হৃদয় দিয়ে দেবতার পূজা হয়ত করা যায়, কিন্তু

শুধু-হাতে অতিথিকে বরণ করা চলে না। শুধু-হাতের লজ্জা সারা হৃদয় দিয়েও ঢাকা যায় না।

পাঁচি এল চোখ-ভরা জল নিয়ে। দুঃখিনী মা তার চোখের জল মুছাবারও সাহস করলে না। বড় আদরের একটি মাত্র মেয়ে তার—তার সর্ব্বকনিষ্ঠ কোল-পোঁছা সন্তান। বুকে সে তুলে নিল তাকে, কিন্তু তাতে শান্তি সে পেল না, বুক তার ফেটে যেতে লাগল কান্নায়, বেদনায়! মা কেঁদে উঠল, "ওরে হতভাগিনী মেয়ে, এ কাঁটার বুকে শুধু যে ব্যথাই পাবি মা আমার! এখানে সুখ শান্তি কোথায়?"

মেয়ের প্রথম সন্তান পিত্রালয়েই হয়—এই দেশের চির-চলিত প্রথা। অতি বড় দুঃখীও তার মেয়ে প্রথম সন্তান-সম্ভাবিতা হ'লে নিজে গিয়ে মেয়েকে আনে, সাধ আরমান করে, মেয়েকে 'সাধ' খাওয়ায়। পাঁচি যখন প্রসব বেদনায় আর্ত্তনাদ করছিল অথচ অর্থাভাবে ধাত্রীও ডাকতে পারা যাচ্ছিল না কা'ল রাত্রি থেকে, তখন তার মা-র যন্ত্রণা বুঝছিলেন —যদি বেদনার বোধশক্তি তাঁর থাকে—এক অন্তর্যামী!

নিজে থেকে এসেছে ব'লেই—এবং মেয়ের কপাল পুড়েছে ব'লেই কি তার যত্ন আদরও হবে না একটু? কিন্তু হয় কিসে!—নিঃসম্বল জননী কাঁদে, ছুটে বেড়ায়, কিন্তু করতে কিছুই পারে না।

ছেলের ওপর অভিমান ক'রে কিছুই বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু আর সে থাকতে পারল না। ছেলের কাছে এসে কেঁদে পড়ল, "ওরে পাঁচি যে আর বাঁচে না।"

চা খেয়ে এসেও প্যাঁকালের উষ্মা তখনও কাটেনি। সে টেঁড়ি

কাটতে কাটতে মুখ না তু'লেই বলল, "মরুক! আমি তার কি করব? দাইয়ের টাকা দিতে পারবি?"

সত্যিই ত, সে কি কর্‌বে। টাকাই বা কোথায় পাওয়া যায়।

হঠাৎ পুত্র মুখ তু'লে ঝাঁজের সঙ্গে ব'লে উঠল, "রোজ ঝগ্‌ড়া কর্‌বি মুলোর মা'র সঙ্গে, নইলে সে-ই ত এত্‌খন নিজে থেকে এসে সব কর্‌ত!"

মুলোর মা আর কেউ নয়,—আমাদের সেই ভীমা প্রখর-দশনা শ্রীমতী হিড়িম্বা। সে শুধু ঝগ্‌ড়া করতেই জানে না, একজন ভাল ধাত্রীও।

ইতিমধ্যে পাঁচি চীৎকার ক'রে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ল। মায়ের প্রাণ আর থাক্‌তে পারল না। বৌদের ডেকে মেয়েকে দেখতে ব'লে সে তাড়াতাড়ি হিড়িম্বাকে ডাকতে বেরিয়ে পড়ল।

হিড়িম্বা তখন তার বাড়ীর কয়েকটা শশা হাতে নিয়ে বাবুদের বাড়ী বিক্রি করতে যাচ্ছিল। পথে গজালের মার সঙ্গে দেখা হতেই সে মুখটা কুঁচ্‌কে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু গজালের মার তখন তা লক্ষ্য করবার মত চোখ ছিল না। সে দৌড়ে হিড়িম্বার হাত দুটো ধ'রে বললে, "মুলোর মা, আমায় মাফ কর্‌ ভাই! একটু দৌড়ে আয়, আমার পাঁচি আর বাঁচে না!"

হিড়িম্বা কথা কয়টা ঠিক বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে গেল। সে একটু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, "এ কি ন্যাকামি লা? তুই কি আবার কাজিয়া কর্‌বি নাকি পাড়ার মাঝে পেয়ে?"

গজালের মা কেঁদে ফেলে বললে, "না বোন সত্য বল্‌ছি, আল্লার

কিরে! আমার পাঁচির কা'ল থেকে ব্যথা উঠেছে; ঝগড়া তোর গজালের মার সঙ্গেই হয়েছে, পাঁচির মার সঙ্গে ত হয়নি!"

হিড়িম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, "অ! তা তোর পাঁচির ছেলে হবে বুঝি? তা আ'ত (রাত) থেকে কষ্ট পাচ্ছে—আর আমায় খবর পাঠাস নি? আচ্ছা মা যাহোক বাবা তুই! আমরা হ'লে ধন্না দিয়ে পড়তাম গিয়ে। চ' দেখি গিয়ে!"

হিড়িম্বা যেতেই পাঁচি কেঁদে উঠল, "মাসী গো, আমি আর বাঁচ্‌ব না।"

হিড়িম্বা হেসে বললে, "ভয় কি তোর মা; এই ত এখনি সোনার চাঁদ ছেলে কোলে পাবি।"

পাঁচি অনেকটা শান্ত হ'ল। ধাত্রী আসার সান্ত্বনাই তার অর্দ্ধেক যন্ত্রণা কমিয়ে দিলে যেন।

একটু তদ্‌বির করতেই পাঁচির বেশ নাদুস্-নুদুস্ একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'ল। সকলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ওলো, ছেলে হয়েছে লো! ছেলে হয়েছে যে?"

ওদের খুশি যেন আর ধরে না! ওরা যেন ঈদের চাঁদ দেখেছে!

হিড়িম্বা মূর্চ্ছিতপ্রায় পাঁচির কোলে ছেলে তুলে দিয়ে বললে, "নে ছেলে কোলে কর্। সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে!"

পাঁচি অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগ্‌ল!

নবশিশুর ললাটে প্রথম চুম্বন পড়ল না কারুর, পড়ল দুঃখিনী মায়ের অশ্রুজল!...

গজালের মা হিড়িম্বার হাত ধ'রে বললে, "দিদি, আমায় মাফ কর্!"

হিড়িম্বার চোখ ছল ছল ক'রে উঠল। সে কিছু না বলে সস্নেহে খোকার কপালে-পড়া তার মায়ের অশ্রুজল-লেখা মুছিয়ে দিলে।

বাইরে তখন ক্রীশ্চান ছেলেদের দেখাদেখি মুসলমান ছেলেরাও গাচ্ছে—

"আমরা যীশুর গুণ গাই!"

(৩)

এই সব ব্যাপারে কাজে যেতে সেদিন প্যাঁকালের বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। তারি জুড়িদার আরও জন তিন-চার রাজমিস্তিরি এসে তাকে ডাকাডাকি আরম্ভ ক'রে দিলে।

প্যাঁকালে না খেয়েই তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এল। সে জানত কা'ল থেকে চালের হাঁড়িতে ইঁদুরদের দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা বসেচে। তাদের কিচিরমিচির বক্তৃতায় আর নেংটে ভলান্টিয়ারদের ছুটোপুটির চোটে সারারাত তার ঘুম হয়নি।

কিন্তু চা'ল যদি বা চারটে জোগাড় করা যেত ধারধুর ক'রে, আজ আবার চুলোও নেই। উনুন-শালেই পাঁচির ছেলে হয়েছে। ও-ঘর নিকুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

ঘরের তাদের চা'লের হাঁড়িগুলো যেমন ফুটো, চালও তেমনি সমান ফুটো। সেখানে বাসা বাঁধবার খড় না পেয়ে চড়াইপাখীগুলো অনেক দিন হ'ল উড়ে চ'লে গেছে। কিন্তু অর্থের চেয়েও বেশি টানাটানি ছিল তাদের জায়গার।

যেটা উনুন-শাল, সেইটেই ঢেঁকিশাল, সেইটেই রান্নাঘর এবং সেইটেই রাত্রে জনসাতেকের শোবার ঘর। তারই একপাশে দরমা

বেঁধে গোটা বিশেক মুরগী এবং ছাগলের ডাক-বাংলো তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছে।

প্যাঁকালে না খেয়েই কাজে গেল, তার মা-ও তা দেখলে। কিন্তু ঐ শুধু দেখলে মাত্র, মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন, চোখে কিন্তু তার জল দেখা গেল না। বরং দেখা গেল সে তার মেয়ের আঁতুর ঘরে ঢুকে তার খোকাকে কোলে নিয়ে দোলা দিতে দিতে কী-সব ছড়া-গান গাচ্ছে।

একটি ছোট্ট শিশু তার জোয়ান রোজগেরে ছেলেদের অকালমৃত্যু ভুলিয়েছে। একটা দিনের জন্যও সে তার দুঃখ ভুলেছে। তার অনাহারী ছেলের কথা ভুলেছে!

প্যাঁকালে যেতে যেতে তার মা-র খুশি মুখ দেখলে, বোনের ছেলেকে নিয়ে গানও শুন্‌ল। চোখ তার জলে ভ'রে এল। তাড়াতাড়ি কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখ দুটো মুছে সে হাসতে হাসতে বা'র হয়ে পড়ল।

রাজমিস্ত্রিদলের মোনা প্যাঁকালের সুর্কি-লাল কোটটার পকেটে ফস্ ক'রে হাত ঢুকিয়ে বল্‌লে, "লে ভাই, একটা 'ছিক্‌রেট' বের কর্! বড্ডো দেরি হয়ে গেল আজ, শালা হয়ত এতক্ষণ দাঁত খিঁচুচ্ছে!"

প্যাঁকালে পথ চলতে চলতে বলল, "ও গুড়ে বালি রে মনা, ছিকরেট ফুরিয়ে গেছে।"

আল্লারাখা তার কাছা খুলে কাছায়-বাঁধা বিড়ির বাণ্ডিলটা সাবধানে বের ক'রে বল্‌লে,—"এই নে, খাকি ছিক্‌রেট আছে, খাবি?"

কুড়্‌চে বাণ্ডিল থেকে ফস্ করে একটি বিড়ি টেনে নিয়ে, সায়েবদের মত ক'রে বাম ওষ্ঠপার্শ্বে চেপে ধ'রে ঠোঁট-চাপা স্বরে বল্‌লে, "জিয়াশলাই আছে রে গুয়ে, জিয়াশলাই?"

গুয়ে তার 'নিমার' ভেতর-পকেট থেকে বারুদ-ক্ষয়ে-যাওয়া ছুরি-মার্কা দে'শালাইয়ের বাক্সটা বের ক'রে কুড়'চের হাতে দিয়ে বল্লে, "দেখিস, একটার বেশি কাঠি পোড়াসনে যেন। মাত্তর আড়াইটি কাঠি আছে।"

কুড়চে কাঠির ও খোলের দুরবস্থা দেখে বললে, "তুইই জ্বালিয়ে দে ভাই, শেষে বলবি, শালা একটা কাঠি নষ্ট করে ফেলল!"

গু'য়ের ওদিক দিয়ে মস্ত নাম। ঝড়ের মধ্যেও সে এমনি কায়দা ক'রে দিয়াশালাই ধরাতে পারে যে, কাঠিটা শেষ হ'য়ে না পোড়া পর্য্যন্ত নিবে না!

দেশালাইয়ের খোলার ঘসা-বারুদে গুয়ে কৌশলের সঙ্গে আধখানা কাঠিটা নিয়ে একটি ছোট্ট টোকা মেরে জ্বালিয়ে ফেলেই দুই হাতের তালু দিয়ে তার শিখাকে বাতাসের আক্রমণ হ'তে রক্ষা ক'রে এমন ক'রে কুড়চের মুখের সাম্‌নে ধর্‌লে যে, তা দেখবার জিনিষ।

বিড়িটা যতক্ষণ না আঙুল পুড়িয়ে ফেললে, ততক্ষণ এ মুখ ও মুখ হয়ে ফিরতে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্দার মিস্তিরির, আর যার বাড়ীতে কাজ করছে তার চৌদ্দ পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধও হ'তে লাগ্‌ল।

'ওমান কাত্‌লি' পাড়ার ভিতর দিয়েই যাচ্ছিল তারা। একটা বিশিষ্ট ঘরের সামনে গিয়েই প্যাঁকা'লে গান ধ'রে দিলে :

"কালো শশী রে, বিরহ্ জ্বালায় মরি!"

তাকে কিন্তু বেশিক্ষণ বিরহ-জ্বালায় মর্‌তে হ'ল না! বাড়ীর ভিতর থেকে কল্‌সী-কাঁখে একটি কালোকুলো গোলগাল মেয়ে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি যেন একখানা চার পয়সা দামের চৌকো পাঁউরুটি! কিন্তু

মোটা সে একটু বেশি রকমের হ'লেও চোখে মুখে তার লাবণ্য ছিল অপরিমিত। চোখ দু'টি যেন লাবণ্যের কালো জলে ক্রীড়া-রত চটুল সফরী—সদাই ভেসে বেড়াচ্ছে; ভুরু জোড়া যেন গাঙ্-চিলের ডানা—ঐ সফরীর লোভে, চোখের লোভে উ'ড়ে বেড়াচ্ছে।

না-বলা কথার আবেশে পাৎলা ঠোঁট দুটি কাঁপছে কচি নিমপাতার মত।

নাকটি যেন মোহনবাঁশী। চিবুকের মাঝখানটিতে নাশপাতির মত ছোট্ট টোল।

শ্রাবণ-রাতের মেঘের মত চুল।

কিন্তু মুখের ওর এত লাবণ্যকে যেন বিদ্রূপ করছে ওর বাকি শরীরের স্থূল চৌকো গড়ন।

মেয়েটি মধু ঘরামীর। মধু আগে মুসলমান ছিল, এখন 'ওমান কাত্‌লী' হয়েছে।

মেয়েটির নাম কুর্শি। বয়স চৌদ্দর কাছাকাছি। দেখে কিন্তু ষোলো—সতের ব'লে ভ্রম হয়। একটু বেশি বাড়ন্ত।

সর্দার মিস্তিরির মিষ্টি আলোচনাটা তখন এমনি জোরের সঙ্গে চলছিল দলের মধ্যে যে, তারা দেখতেই পেলে না, কখন কুর্শি তাদের কচার বেড়ার ধারে চোখ-ভরা ইঙ্গিত নিয়ে এসে দাঁড়াল এবং প্যাঁকালেও হঠাৎ পিছিয়ে পড়ল।

কিন্তু কথা বলবার তারা সুযোগ পেলে না। পিছনে একটা গরুর গাড়ী আসছিল—প্যাঁকালে তা খেয়াল করেনি। গাড়ীর গাড়োয়ান কিন্তু মেয়েটার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। কচাগাছের কাছে কলসী নিয়ে

সাতজন্ম দাঁড়িয়ে থাকলেও যে জল পাওয়া যায় না, এ ত জানা কথা। গাড়োয়ানটা তার উৎসাহ থামিয়ে রাখতে পারলে না। হঠাৎ সে গেয়ে উঠল :

"ছোঁড়ার মাথায় বাবরি-কাটা চুল,
হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল!"

গান ত নয়, ঋষভ-চীৎকার! সে চীৎকারে ছোঁড়া ছুঁড়ির প্রেম ততক্ষণে হৃদয়দেশ ত্যাগ করে বহু উর্দ্ধে উধাও হয়ে গেছে!

প্যাঁকালে অকারণে পাশের রেতো কামারের দোকানে ঢুকে পড়ে। গাড়োয়ান শুনতে পায় এমনি চেঁচিয়েই বললে, "এই! আমার বড়্‌শিটা কখন দিবি?" বলা বাহুল্য, কামারকে সে বড়শি গড়তে কোন দিনই দেয়নি।

ওদিকে কুর্শি হঠাৎ কলসী নামিয়ে একটা কচার ডাল ভেঙে পাশের ছাগলটাকে অকারণে দু'ঘা কষিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "পোড়ারমুখীর ছাগল! রোজ রোজ এসে বেগুন গাছ খেয়ে যাবে!"

এখানেও বেগুন গাছের উল্লেখটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।

রসিক গাড়োয়ান গান গাওয়ার মাঝে ডাইনের বলদটার ঠেশে ল্যাজ মুষড়ে দিয়ে এবং বামের বলদটার তলপেটে বাম পা'টার সাহায্যে বেশ ক'রে কাতুকুতু দিয়ে,—জিহ্বা ও তালু-সংযোগে জোরে দু'টো টোকার মেরে শেষের কলিটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল—"ও ছুঁড়িরা মজাইল, হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল।"

যন্ত্রণায় ও কাতুকুতুর ঠেলায় বলীবর্দ্দযুগল উর্দ্ধপুচ্ছ হয়ে ছুট্ দিল।

প্যাঁকালে একবার হতাশ নয়নে ছাগল-তাড়না-রত কুর্শির দিকে

তাকিয়ে দৌড়ে জুড়িদের সঙ্গ নিলে। তখনো গাড়ী ছুটছে, কিন্তু গাড়োয়ানের মুখ ফিরে গেছে পেছন দিকে।

গাড়ীর ধুলোর ভয়ে দলের ওরা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। জনাব ব'লে উঠল, "উঃ, শালার গলা ত নয়, যেন হাঁড়োল! ও শালা কে রে?"

প্যাঁকালে কটুকণ্ঠে বলে উঠল, "ঐ শালা ন্যাড়া গয়লা-শালা গান করছে না ত, যেন হামলাচ্ছে।"

সকলেই হেসে উঠল।

হঠাৎ ওদেরই একজন চেঁচিয়ে উঠল, "খড়গ্ পাঁচে।"

অমনি সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যে ঐ ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করলে তার গা টিপে আর একজন আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় রে?"

অদূরে সাইকেল রেখে এক ভদ্রলোক রাস্তার ধারেই একটা অপকর্ম্ম করতে বসে গেছিলেন। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে প্যাঁকালে বললে, "উ-ই যে, নীল চোঁয়ায়।"

এতক্ষণে ঐ অপকর্ম্মরত ভদ্রলোকটিও দেখে ফেলেছিলেন, এবং এরাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিল।

ঐ ভদ্রলোকটির বাড়ীতেই এরা রাজমিস্তিরির কাজ করে।

এদেশের রাজমিস্তিরিদের অনেকগুলো 'কোডওয়ার্ড'—সাঙ্কেতিক বাণী আছে—যার মানে এরা ছাড়া অন্য কেউ বোঝে না। 'খড়গ পাঁচে' বাবু বা সায়েব আস্‌ছে বা দেখছে, আর 'নীল চোঁয়ায়' ব্যবহৃত হয় ঐ অপকর্ম্মটির গূঢ় অর্থে।

এর পরেই দলকে দল হঠাৎ এমন সব বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দিলে, যা শুনে তাদের অতি নিরীহ চির-দুঃখী জন্‌-মজুর ছাড়া কিছু ভাবা যায় না।

(৪)

প্যাঁকালে চ'লে যাবার পরই তার দ্বাদশটি ক্ষুধার্ত্ত ভাইপো-ভাইঝি মিলে যে বিচিত্র সুরে 'ফরিয়াদ' করতে লাগল ক্ষুধার তাড়নায়, তাতে অন্নের মালিক যিনি, তিনি এবং পাষাণ ব্যতীত বুঝি আর সব-কিছুই বিচলিত হয়।

সেজ-বৌ হপ্তাখানিক হ'ল টাইফয়েড থেকে কোনো রকমে বেঁচে উঠেছে। কিন্তু ঐ বেঁচে উঠেছে মাত্র। বেঁচে থাকার চিহ্ন শ্বাস-প্রশ্বাস-টুকু ছাড়া তার আর কিছু নেই। দেহের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা কবরে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে না। যেন কুমিরে চিবিয়ে গিলে আবার উগলে দিয়ে গেছে।

কসাই যেমন ক'রে মাংস থেঁতলায়, রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য এই চারটিতে মিলে তেমনি ক'রে যেন থেঁতলেছে ওকে।

ওরই কোলে খোকা।—স্বামীর শেষ স্মৃতিটুকু। মাত্র দু মাসের। জন্মে অবধি মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে চামচিকের মত হয়ে গেছে।

শুষ্ক ক্ষীণকণ্ঠে অসহায় শিশু কাঁদে, আর একবার ক'রে তার কণ্ঠের চেয়েও শুষ্ক মায়ের বুকে একবিন্দু দুধের আশায় বৃথা কান্না থামায়। আবার কাঁদে। কান্না ত নয়, যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ। যেন ওকে কে গলা টিপে মেরে ফেলছে।

ওর মা-ই তখন চেঁচিয়ে বলে, "আল্লা গো, আর দেখতে পারিনে, তুলে নাও বাছাকে তোমার কাছে। ও ম'রে বাঁচুক।"

চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

খোকা কান্না থামিয়ে সেই নোনাজল চাটে, আবার কাঁদে।

মেয়েদের ঘর থেকে শাশুড়ী তার নবাগত নাতিকে মেয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসে কান্নাকটু কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে, "মর্ মর্ মর্ তোরা। এত লোককে নেয়, আর তোদেরই ভুলেছে যম।" তারপর বৌদের উদ্দেশ ক'রে বলে, "নে লো বেটাখাগীরা, তোদের এই হারামদের মাথা চিবিয়ে খা। মাগীরা শুয়োরের মত ছেলে বিইয়েছে সব। বাপরে বাপ! জান যেন তেতবিরক্ত হয়ে গেল!"

ব'লেই সে উচ্চৈঃস্বরে তার মৃত পুত্রদের নাম করে কাঁদে। ততক্ষণ বড়-বৌ জলের ঘড়াটা নামিয়ে বড় ছেলেমেয়ে দু'টোকে ধরতে না পেরে এক বছরের ছোট মেয়েটার পিঠেই মনের সাধে ঝাল মেটাতে থাকে।

মেজ-বৌ ছাড়াতে যায়, পারে না। মেয়েটাকে ছাড়াতে গিয়ে তারও পিঠে পড়ে দু-এক ঘা। মেজ-বৌ হাসে, আর বাকি ছেলেগুলোকে পালাবার ইঙ্গিত করে।

তার নিজের ছেলেমেয়ে দুটির দিকে চেয়েও দেখে না। ওরা যেন ওদের মায়ের গুণ পেয়েছে। বাড়ীর মধ্যে ঐ ছেলেমেয়ে কয়টাই যা শান্ত। খিদে পেলে চুপি চুপি মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, "মা, বড্ডো খিদে পেয়েছে।"

আজও মেজ-বৌ যখন বড়-বৌএর ক্রন্দনরত ছোট মেয়েটাকে বুকে ক'রে দোলা দিতে দিতে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তখন তার ছেলেমেয়েরা স্থির

শান্তভাবে একটা কাঁচা কৎবেল ভেঙে সেইটে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছিল। কেবল ছোট ছেলেটি তার মায়ের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল।

হঠাৎ সে ব'লে উঠল, বুবু! অ বু-উ। মা আবার মেনিকে নেমিয়ে দেবে কোল থেকে ?"

কাঁচা কৎবেলের কষায় রসে তার বুবুর জিহ্বা তখন তালুতে ঠেকেছে গিয়ে। সে কোনো রকমে বললে, "হুঁ।"

মেজ-বৌ তার ছেলেমেয়ের দিকে ফিরে বললে, "পটলি, যা দেখি চারটে কাঠ কুড়িয়ে আন গিয়ে, আমি তোদের তরে ক্ষীর রেঁধে দিচ্ছি।"

মায়ের ভয়ে যে ছেলেমেয়ে কয়টির এতক্ষণ উদ্দেশ ছিল না, ক্ষীরের উল্লেখে তারা এইবার যেন মন্ত্রবলে পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

মেজ-বৌকে ঘিরে নেচে কুঁদে তার কাপড় টেনে চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে ওরা যেন একটা পেল্লায় কাণ্ড বাধিয়ে দিলে। যেন মেজ-বৌকেই ছিঁড়ে খাবে।

এক পাল ছাতার পাখী যেন একটা পোকা দেখতে পেয়েছে।

মেজ-বৌর ছোট ছেলেটি এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল, এইবার সে আস্তে আস্তে তার ক্রন্দন-রত দাদীর কোলে এসে ব'সে কী ভাবতে লাগল। তারপর তার গায়ের ছেঁড়া ময়লা জামাটা খু'লে দাদীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "দাদী, চুপ কর্, মা ক্ষীর রাঁধছে, তুই খাবি, আমি খাব, বু খাবে।"

তার দাদীর কান্না থামে। ঐ ক্ষুদ্র শিশু! তার বাবাও ছিল ছেলেবেলায় ঠিক এমনটি দেখতে। কার জন্য কাঁদছে সে? এই ত তার

সোভান। ঐ যাদের এত ক'রে গালি দিচ্ছিল সে, তারাই ত তার বারিক গজালে। খিদে পেলে এমনি ক'রে কাঁদত তারা। কাঁদলে সোভন এমনি ক'রে কোলে ব'সে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতো, "মা, তুই কাঁদিসনে, আমি বড় হয়ে তোকে তিন কুড়ি টাকা এনে দেব।" কে বলে সোভান মরেছে? এই ত সে-ই এসেছে আবার তেমনি খোকাটি হয়ে। এই ত রয়েছে তার গলা জড়িয়ে ধরে। চুমায় চোখের জলে শিশুর মুখ অভিষিক্ত ক'রে দেয়।

শিশুর ক্ষুদ্র মুখ ঝলমল করে চিরদুঃখিনীর কোলে—যেন বর্ষা রাতের ম্লান চাঁদ।

শিশু হঠাৎ দাদীর কোল থেকে উঠে দৌড়ে মায়ের গায়ে মাথা হেলান্ দিয়ে বসে। আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভাবে। চোখের সামনে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুঘু উড়ে যায়। নীল স্বচ্ছ আকাশ—রোদ লেগে যেন আরো করুণ হ'য়ে ওঠে। কত দূর ঐ আকাশ!

হঠাৎ সে মার আঁচল টেনে বলে, "মা, তুই যে বলেছিলি, ক্ষীর-পরবের দিন বা-জান (বাবা) আসবে। আজ আমরা ক্ষীর রাঁধছি যে, বা-জান আসবে ও-ই মেঘ ফুড়ে! নয়?"

মা শুকনো পাতার ওপর লুটিয়ে পড়ে। মুখের গান তার চোখের জলে ভেসে যায়।—শুকনো আমপাতা আপন মনে পুড়তে পুড়তে তার দিকে এগোয়।

শাশুড়ী ছুটে এসে লুটিয়ে-পড়া বৌকে তুলবার চেষ্টা করতেই মেজ-বৌ অমনি ধড়মড়িয়ে ওঠে, তারপর কাঠি দিয়ে আবার উনুনে পাতা ঠেলে।

এইবার খোকা কিছু না ব'লে চুপ ক'রে বসে থাকে।

তার দাদী বলে, "দেখ বৌ, সোভান দিনরাত এমনি মন-মরা হয়ে থাকত—ছেলেবেলা থেকেই।

মেজ-বৌ আবার গুন গুন ক'রে গান করে।

শাশুড়ী বলে, "আ মলো যা। ছুঁড়ি যেন দিনেকৃকের দিন কচি খুকী হয়ে উঠছে! যখনি কান্না, তখনই হাসি।" বলেই খোকাকে টেনে কোলে তুলে অকারণে সারা উঠান ঘুরে বেড়ায়।

খোকা অনর্গল প্রশ্ন করে,—"দাদী গো. বা-জান এখন খু-ব বড় হয়ে গিয়েছে—লয়? সেই যে কয়েছিল, আমার জন্যে বিস্কুট আনবে—। হু-ই গোয়াড়ির বাজার—সে অনেক দূর! লয় দাদী? এনেক দিন লাগে যেতে আসতে। লয় দাদী? আমার লাল জামাটা লালুকে দিয়ে দিব, বা-জান আর একটা লাল জামা আনবে। লয় দাদী?"

দাদী কতক শোনে, কতক শোনে না। উঠোনময় ঘু'রে বেড়ায়!

সেজ-বৌ শুয়ে শুয়ে ক্ষীর-রান্না দেখে। কচি ছেলেটা ততক্ষণে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে মায়ের বুকের হাড়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষীর-রান্না হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যা পায়—থালা, বাটী, ঘটী, বদনা—তাই নিয়ে উনুন ঘিরে ব'সে যায়।

অপূর্ব্ব সেই ক্ষীর! অদূরে দারোগা মির্জ্জা সাহেবের বাড়ী। তাঁরই বাড়ীর দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যে-টুকু ফেলে গিয়েছিল, তাই দারোগা-গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ী। তাঁর অপার করুণা, তাই সেই স্বল্প দুধে জল মিশিয়ে আধ পোয়া দুধকে আধ সের ক'রে ঝি-র হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই না-চাইতেই জল পেয়ে

এদের সকলের চোখ দিয়ে যে কৃতজ্ঞতার জল পড়েছে, তা ঐ আধ সের জলের চেয়ে অনেক বেশি!

বাড়ীতে চা'ল ছিল সেদিন বাড়ন্ত। মুরগির সদ্য খোলা হ'তে ওঠা বাচ্চাগুলির জন্য যে ক্ষুদগুড়ার রিজার্ভ স্টোর ছিল ছটাক তিনেক, দারোগা-বাড়ীর দুগ্ধ সংযোগে তাই সিদ্ধ হয়ে হ'ল এই উপাদেয় ক্ষীর। এই ক্ষুধিত শিশুদের এই আজকের সারাদিনের আহার।

এই তাদের ক্ষীর-পরব ঈদ্।

লবণ-সংযোগে শিশুদের সেই অপূর্ব্ব পরমান্ন খাওয়া দেখে চোখে জল এল শুধু মেজো-বৌর।

সে তাড়াতাড়ি কচার বেড়ার কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কয়েকটা কচাপাতা নিয়ে কাঠি দিয়ে সিইয়ে তাই বাটীর মত করে তাতে খানিকটা ক্ষীর ঢেলে সেজ-বৌর কাছে এনে ধরল!

সেজ-বৌ উঠে বসে করুণ ক্ষীণ-কণ্ঠে বললে, "মেজ বু, তুমি?"

মেজ-বৌ একটু হাসলে। রাহুগ্রস্ত চাঁদের কিরণের মত ম্লান পাণ্ডুর সে হাসি।

সেজ-বৌ মেজ-বৌকে জানত। সে আর কিছু না ব'লে খেতে খেতে হঠাৎ থেমে ব'লে উঠল, "খোকা কি এই ক্ষীর খাবে মেজ-বু?"

মেজ-বৌ বললে, "সে কথা তোকে ভাবতে হবে না, খোকার জন্যে দুধ রেখেছি। উঠলে খাইয়ে দেবো।"

বড়-বৌ জলের ঘড়াটা নামিয়ে রেখে হাতটা আগুনের তাতে ধ'রে ব'লে উঠল, "উঃ, কোমর কাঁকাল ধরে গেল মেজ-বৌ, কাল থেকে

তুই জল আনিস, আমি বরং ধান ভানব।" ব'লেই হাতটা সেকৃতে সেকৃতে বলতে লাগল, "আমার হাত ফুলে গেল গতরখাগীকে মারতে মারতে। হারামজাদীর পিঠ ত নয়, পাথর!"

ছেলে মেয়েরা ততক্ষণে ক্ষীর খেয়ে মহানন্দে 'বৌ পালালো' খেলছে। ওদেরই একজন পলায়নপরায়ণা বধূ হয়ে তার না-জানা বাপের বাড়ীর পানে দৌড়েছে এবং তার পিছনে বাকি সবাই গাইতে গাইতে ছুটছে—

"বৌ পালালো বৌ পালালো ক্ষুদের হাঁড়ি নিয়ে,
সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝ্যাঁটা নিয়ে।"

সন্ধ্যে হব-হব সময় প্যাঁকালে হাতে চা'ল-ডাল, বগলতলায় ফুটগজ, পকেটে কম্বিক-সুত, আর মুখে পান ও বিড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ছেলে-মেয়ে তাকে যেন ছেঁকে ধরল।

চাল ডালের মধ্যে একটা বোয়াল মাছ দেখে তারা একযোগে চীৎকার ক'রে উঠল। যেন সাপের মাথার মানিক দেখেছে।

প্যাঁকালে তার কোটের হাতায় হাত দুটো মুছে তিনটে ছোট কাগজের পুরিয়া বের ক'রে বললে, "আজ নলিত ডাক্তারের বাড়ীর খানিকটা পলস্তারা ক'রে দিয়ে এই এই ওষুধ নিয়ে এয়েছি সেজ-ভাবীর তরে। দাঁড়া, এক পুরিয়া খাইয়ে দিই আগে।"

সেজ-বৌ ওষুধ দেখে খুশি হয়ে ব'লে উঠল, "ই কোন্ ওষুধ ছোট-মিঁয়ে? এলোপাতাড়ি না হৈমুবাতিক?"

প্যাঁকালে বিজ্ঞতার হাসি হেসে বললে, ই এলিওপাতি নয় সেজ-ভাবী, হোমিওবাতি। গুড়ের মতন মিষ্টি। খেয়েই দেখ।"

ওষুধ খেয়ে সেজ-বৌর মনে হতে লাগল, সে যেন ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে উঠছে। সে তার খুশি আর চেপে না রাখতে পেরে বলতে লাগল, "আর দুটো দিন যদি ওষুধ পাই মেজবুবু, তা হ'লে আসছে-মাস থেকেই আমি একা একরাশ ধান ভান্‌তে পারব।"

মেজ বৌ চাল-ডাল তুলতে তুলতে বললে, "তাই ভাল হয়ে ওঠ্ ভাই আল্লা ক'রে, আমি আর পারি না ঢেঁকিতে পাড় দিতে। আমার কাপড় সেলাই-ই ভাল, ওতে দু'পয়সা কম পেলেও সোয়াস্তি আছে।"

বড়-বৌ বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে তার ঘুঁটে-দেওয়া হাতের গোবর চেঁছে

তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে, "ঐ সেলাইটা আমায় শিখিয়ে দিতে পারিস্‌নে মেজ-বৌ! তবে রীপু করাটা কিন্তু আমায় দিয়ে হবে না।"

মেজ-বৌ হাসে, আর গুন্‌ গুন্‌ করে গান করতে করতে মাছ কোটে। ছেলে-মেয়েদের দল মেজ-বৌকে ঘিরে হাঁ ক'রে মাছ কোটা দেখে, আর কে মাছের কোন্‌ অংশটা খাবে, এই নিয়ে কলহ করে। যেন কাঁচাই খেয়ে ফেল্‌বে ওরা।

বড় ছেলে-মেয়ে দুটোতে মিলে ইঁদারায় জল তুলে দিতে বলে, "আচ্ছা ছোট চাচা, আজ মাছের মুড়োটা ত তুমিই খাবে? পট্‌লি বল্‌ছিল, ছোট-চা আজ আমায় দেবে মুড়োটা!"

প্যাঁকালে স্নান করতে করতে কী ভাবে! শুধু বলে, "হুঁ!"

তার এই 'হুঁ' শুনে ছেলেটি আতঙ্কিত হয়ে উঠে বলে, "আচ্ছা ছোট্‌ চা, আমাকে কাল থেকে 'যোগাড়' দিতে নিয়ে যাবে? উ-ই ও-পাড়ার ভুলো ত আমার চেয়ে অনেক ছোট, সে রোজ দু আনা ক'রে আনে 'যোগাড়' দিয়ে।—আচ্ছা ছোট্‌-চা, দু আনায় একটা মাছ পাওয়া যায় না?"—তারপর তার বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, "কাল থেকে আমার একা একটা মাছ! দেখাব আর খাব! ঐ পট্‌লিকে যদি একটা আঁশ ঠেকাই, তবে আমার নাম গোরাই নয়, হুঁ হুঁ।

তার বোন্‌ মুখ চুন ক'রে দাঁড়িয়ে কি একটা মত্‌লব ঠাওরায়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, "আমিও কাল থেকে দারোগা সায়েবের খুকীর গাড়ী ঠেলব—হুঁ হুঁ! আমায় সায়েব তিন ট্যাকা ক'রে মাইনে দেবে বলেছে! দু আনা নয়—তিন ট্যাকা। আমিও তখন ছোট্‌-চা'কে দিয়ে জিলিবি আর মেঠাই আনাব।"

প্যাঁকালে স্নান সেরে তার বোনের আঁতুড় ঘরে ঢুকে বললে, "কইরে পাঁচি, তোর ছেলে দেখা!"

পাঁচি কিছু বলবার আগেই ওর মা ছুটে এসে বললে, "হ্যাঁরে প্যাঁকালে, শুধু হাতে দেখবি কি ক'রে?"

প্যাঁকালে নিজের রিক্ততায় সঙ্কুচিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "আচ্ছা, কা'ল কিম্বা আর একদিন দেখব এসে। আমার—শালা—মনেই ছিল না যে, শুধু হাতে দেখ্‌তে নেই।" বলেই সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে মেজ-বৌর কাছে গিয়ে বসল।

মাছটা চড়িয়ে দিয়ে তখন মেজ-বৌ ভাতের ফ্যান গাল্‌ছিল। এধার ওধার একটু চেয়ে নিয়ে সে বললে, "সেজ-বৌ কিন্তু বাঁচবে না ছোট মিয়ে!" ব'লেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগল, "ওরা মায়ে-পোয়েই যাবে এবার। আজ সারাদিন যা করেছে ছেলেটা! মায়ের বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই, আজ এই সব হেঙ্গামে আবার ছাগলটাও ছেড়ে ফেলেছিলাম। ঐ ছাগলের দুধই ত বাছার জান! একটুকু দুধের জন্যে ছেলেটা যেন ডেঙ্গার মাছের মতন তড়পেছে! তবু ভাগ্যিস, দারোগা সায়েবের বিবি একটুকু দুধ দিয়েছিল। তারই একটুকু রেখেছিলাম, কিন্তু ছেলে তার দু'চামচের বেশি খেলে না। কেঁদে কেঁদে এই একটু ঘুমিয়েছে।" বলেই ভাতের হাঁড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে ভাতগুলো উল্‌টে নিয়ে মুখের সরাটা একটু ফাঁক ক'রে পাশে রেখে দিল।

প্যাঁকালে কিছু না ব'লে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

(৬)

হঠাৎ সেদিন সেজ-বৌর অবস্থা একেবারে যায়-যায় হয়ে উঠল। 'ছিটেন' পাড়ার ন'কড়ি ডাক্তার তাঁর বৈঠকখানাটা বিনি পয়সায় চুনকাম ক'রে দেবার চুক্তিতে দেখতে এলেন। বললেন, "গরীব লোক তোরা, ভিজিট আমি নেব না বাপু। আমার বৈঠকখানাটায় একটু গোলা দিয়ে দিবি, তা দিন তিনেক খাটলেই চলে যাবে। কি বলিস্ ?"

প্যাঁকালে চোখের জল মুছে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

ন'কড়ি ডাক্তার নাড়ী দেখে বললেন, "অবস্থা বড় ভাল ঠেক্‌ছে না রে। হার্টফেল করার বড্ডো ভয়।"

মেজ-বৌ ইশারায় প্যাঁকালেকে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "আচ্ছা বেহুঁস ডাক্তার ত, রোগীর কাছে তার অবস্থা এম্‌নি করে বলে নাকি ?"

ন'কড়ি ডাক্তার বোধ হয় ততক্ষণে মেজ-বৌ-র ইশারার মানে বুঝে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে প্যাকালেকে ডেকে বললে, "ওরে তোদের বাড়ী মুরগির বাচ্চা আছে ত ? একটু ঝোল করে খাওয়া দেখি। এখ্‌খুনি চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌বে। ভাবিস্‌নে কিছু ও ভাল হয়ে যাবে খন।" ব'লেই হাই তুলে দু'টো তুড়ি মেরে মেজ-বৌর মুখের পানে

হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন গিলে খাবে! মেজ-বৌ একটু হেসে হেঁসেল-ঘরে সরে গেল! বড়-বৌ বলে উঠল, "কি লা, হাস্‌ছিস যে বড়!"

মেজ-বৌ ডাক্তার শুনতে পায় এমনি জোরেই ব'লে উঠল, "আখার বাসি ছাইগুলোর কিনারা হল দেখে।" ব'লেই একটু হেসে আবার ব'লে উঠল, "যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনি ছাই-পাশ নৈবেদ্যি।"

ডাক্তার ততক্ষণে উঠে পড়েছে। তখন রোগীর চেয়ে তার নিজের নাড়ীই বেশি চঞ্চল।…

মেজ-বৌর রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়েও ও সোনা যেন এতটুকু মলিন হয়নি। বর্ষা-ধোওয়া চাঁদনির মত আজও ঠিক্‌রে পড়েছে রূপ। পাড়ার মেয়েরা বলে, "মাগী রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড় হচ্চে দিন্‌কে দিন।"

ওর সবচেয়ে বদ-অভ্যাস, কারণে অকারণে ও হাসে। অপরূপ সে হাসি।—যেন ফুটে-ওঠা ফুল হঠাৎ চন্দ্রোদয়।

ডাক্তার মেজ-বৌর শূন্য নিটোল হাত দুটি, এক-জোড়া সাদা পায়রার মত পা আর ঘোমটার অবকাশে সোনার বলসের মত ঠোঁট সহ আধখানি চিবুক ছাড়া 'আর কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু এতেই তার নাড়ী-একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের রোগীর মতই দ্রুত চলছিল।

দোরের কাছে হঠাৎ একটু থেমে ডাক্তার বল্‌লে, "হাঁরে, মুরগির ডিম আছে তোদের বাড়ী? একটা ওষুধের জন্য বড্ডো দরকার ছিল আমার।"

ডাক্তারবাবু চেয়েছেন, এতেই যেন প্যাঁকালে বাধিত হয়ে গেল। সে অতি বিনয়ের সঙ্গে বললে, "এজ্ঞে, তা আছে বই-কি—এই এনে দিচ্ছি।" ব'লেই সে ঘরে ঢুকতেই মেজ-বৌ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে, "আণ্ডা-টাণ্ডা পাবে না ছোটমিঁয়ে! ব'লে দাও গিয়ে, বাড়ীতে আণ্ডা নেই। আ ম'লো, মিন্‌সে যেন কি-বলে-না-তাই। ও আণ্ডা ক'টা বিক্রি ক'রে একবেলার দু'মুঠো ভাত উঠ্‌বে বাছাদের মুখে।"

প্যাঁকালে ততক্ষণে গোটা আটেক ডিম নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। ডাক্তার স্টেথিসকোপ্‌টা তার ঝোলা পকেট থেকে বের ক'রে দিব্যি খুশি হয়ে ডিমগুলি পকেটস্থ করলেন।

মেজ-বৌ একটু চেঁচিয়েই বল্‌লে, "ডাক্তারের গলায় ওটা কি ঝুলছে ছোটমিঁয়ে? মিন্‌সে কি গলায় দড়ি দিলে?"

"প্যাঁকালে এবার একটু রেগেই ব'লে উঠল, "তুমি থাম মেজ-ভাবি, সব সময় ইয়ে ভাল লাগে না, হেঁ।"

মেজ-বৌ সে-কথায় কান না দিয়ে গুন গুন ক'রে গান ধরে—

"কত আশা ক'রে সাগর সেঁচিলাম
মানিক পাবার আশে,
শেষে সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগিনীর কপাল-দোষে।"

গান ত নয়—যেন বুক-ফাটা কান্না।

বড়-বৌ তন্ময় হয়ে শোনে আর বলে, "সত্যি মেজ-বৌ, বড় ঘরে জন্মালে তুই জজসাহেবের বিবি হতিস।" ব'লেই খুব বড় ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে।

মেজ-বৌ সেকথায় কান না দিয়ে উনুন নিকুতে নিকুতে আপন মনে গেয়ে চলে। যেন তার শ্রোতা এ-জগতে কেউ নয়।

"নিঠুর কালার নাম ক'রো না,
কালার নাম করিলে প্রাণ কাঁদিবে
কালায় পড়িবে মনে গো!
নিঠুর কালার নাম ক'রো না।"

গানের স্বর তার অতিরিক্ত কাঁপে—নিশীথ রাতের বাদলা হাওয়া যেমন ক'রে কাঁপে বেণুবনে।

বড়-বৌ সব বোঝে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে যেতে যেতে মেজ-বৌর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, "আজ তুই চোখের পানিতে আখা নিকুবি নাকি?"

সেজ-বৌর খোকা কেবল কাঁদে—দিবারাত্রি সে কান্নার আর বিরাম নাই। যেন পাট পচিয়ে তার ছাল-মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে—বাকি আছে শুধু হাড়—প্যাঁকাটি।

মেজ-বৌ এসে কোলে তু'লে নেয়। বলে, "আহা! বাছার পিঠে ঘা হয়ে গেল শুয়ে শুয়ে!" তারপর মনে মনে বলে, "হায় আল্লা, এই দুধের বাচ্চা কী অপরাধ করেছিল তোমার কাছে? মারতেই যদি হয়, এমন কাঁদিয়ে না মেরে তু'লে নাও বাছাকে।" তারপর বুকে জড়িয়ে চুমো খেতে থাকে।

সেজ-বৌ দেখে আর কাঁদে। বলে, "মেজবু, তুমিই ওর মা। আমি ত চললাম, তুমিই ওকে দেখো। আর যদি ও-ও যায়—"

আর বলতে পারে না, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। পশ্চিমের

দিকে মুখ ক'রে সকল অন্তর দিয়ে প্রার্থনা ক'রে, "আল্লাগো, অনেক অনেক দুষ্‌কুই দিলে, আর দিও না। বাছাকে যদি নিতেই হয়, আমার দু'দিন পরেই নিও।"

মেজ-বৌ খোকাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বলে, "তুই চুপ কর্‌ সেজো। মর্‌তে চাইলেই তোকে মর্‌তে দেবো নাকি লা? এই বেটার রোজগার খাবি, বেটার বিয়েতে নাচবি, তারপর নাতি-পুতি দেখে তোর ছুটি।"—ব'লেই ঘুমন্ত খোকার চোখে চুমু খেয়ে বলে, "খোকার বিয়ে দিব কাজী বাড়ীতে।"

আবার অকারণ হাসি। হাসিতে মুখ-চোখ যেন রাঙা টুকটুকে হয়ে ওঠে। খোকাকে তার মায়ের পাশে শোয়াতে শোয়াতে গায়—

"যাদু আমার লাঙল চষে দুধারে তার কাল গরু,
যাদুর বেছে বেছে বিয়ে দিব পেটমোটা মাজাসরু।"

সেজ বৌও হাসে—বালুচরে অস্ত-চাঁদের ক্ষীণ রশ্মিরেখাটুকুর মত।

(৭)

দিন যায়, দিন আসে, আবার দিন যায়।

এরই মধ্যে একদিন গজালের মা চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে একেবারে মেজ-বৌর পায়ের ওপর প'ড়ে মাথামুড় খুঁড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গালি উপরোধ অনুরোধ অনুনয় বিনয়—তার কতক বুঝা গেল, কতক গেল না।

মেজ-বৌ তাড়াতাড়ি তার শাশুড়ীর মাথাটা জোর ক'রে পায়ের ওপর হ'তে সরিয়ে দু-হাত পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সে এর কারণও বুঝেছিল। তবু কটু কণ্ঠেই ব'লে উঠল, "এ কি মা, তুমি আমার পা ছুঁয়ে আমায় 'গুনায়' (পাপে) ফেলতে চাও নাকি? কেন, কি করেছি আমি?"

তার শাশুড়ী কান্না-বিদীর্ণ-কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, "তা বল্‌বি বই কি লা, আমার জোয়ান-পুত-খাগী। আমার বেটার মাথা খেয়ে এখন চল্‌লি নিকে করতে!—ভলে হবে না লো ভাল হবে না। এই আমি ব'লে রাখছি, বিয়ের রাতেই জা'ত সাপে খাবে তোদের দুই জনেকেই।"—আবার চীৎকার!

তখন ভর-দুপুর। প্যাঁকালে কাজে চ'লে গেছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়েছে—কেউ কাঠ কুড়োতে, কেউ বা গোবর কুড়োতে।

সেজ-বৌ শুয়ে শুয়ে ধুকছে। তার পাশে খোকা, যেন গোরস্থানের নিবু-নিবু মৃৎ-প্রদীপের শেষ রশ্মিটুকু। শুধু একটু ফুঁয়ের অপেক্ষায় আছে।

বড়-বৌ উঠোন নিকোনো ফেলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল, শুনছিল সব। এইবার সে ভয় ও বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "সত্যি নাকি মেজ-বৌ?"

মেজ-বৌ আস্তে বলল, "সত্যি নয়।"

এই দুটি কথার আশ্বাসেই শাশুড়ী যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। সে হঠাৎ কান্না থামিয়ে মেজ-বৌর মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, "সত্যি বলছিস্ মা আমার? সত্যি তুই নিকে করবিনে? তবে যে ভোলাদের ঘরে শুনে এলাম তোকে নিকে করতে তোর বোনাই কলকেতা থেকে এয়েছে? তাই ত বলি; ঐ বুড়ো মিন্‌সে—থাক্‌না ওর টাকা—ওকে কি তুই নিকে করতে পারিস? তা ছাড়া মা, তোর এই ছেলেমেয়ে দুটোর মায়াই বা কাটাবি কি ক'রে বল্‌ত? নিকে করলে ছেলেমেয়ে দুটোকে ছেড়ে দিচ্ছিনে।"

মেজ-বৌ বড়-বৌর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে অন্য কাজে গেল।

বড়-বৌ মেজ-বৌকে ভাল ক'রেই জানত। সে জানে, মেজ-বৌ মিথ্যা বসে না এবং যা বলে, তা চিরকালের জন্যই সত্য হয়ে যায়। সে মেজ-বৌর হাসির মানে বুঝে উঠোন নিকুতে চ'লে গেল। যেতে যেতে

সেও একটু হেসে ব'লে গেল, "পাড়ার গতরখাগীদের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমারো মা তেমনি যত সব কি-বলে-না-ইয়ে—"

শাশুড়ী একটু লজ্জিত হয়েই চোখ মুছে বড়-বৌ যেখানে উঠান নিকুচ্ছিল সেইখানে এসে চুপ ক'রে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বল্ল, "হ্যাঁ লা বড়-বৌ, সত্যিই ছুঁড়ি নিকে করবে না ত? ছুঁড়ির খা রূপ ঠিকরে পড়ছে এখনো, তার ওপর পাড়ার মাগনেড়ে হতচ্ছাড়ারা দিনরাত আছে ছুঁড়ির পানে হা-পিত্যেশ ক'রে তাকিয়ে। আ. ম'লো যা। ড্যাকরারা যেন হুলো বেরাল! ইচ্ছে করে, দিই চোখে 'লগা' ঠেলে। আর ঐ বুড়ো মিন্সে—ওর বোনের সোয়ামী—মিন্সে যে ওর সানি-বাপ! মিনসের লজ্জা করল না কলকেতা থেকে কেষ্টনগর ছুটে আসতে ঐ মেয়ের বয়েসী বৌটাকে নিকে করতে!—ঝাঁটা মার! ঝাঁটা মার!" আরও কত কি ব'কে যায় আপন মনে।

বড়-বৌ আর থাকতে না পেরে একটু রেগেই ব'লে উঠল, "আচ্ছা মা, তোমার কি কিছুই আক্কেল হুঁস নেই? 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই।' যা নয় তাই। মেজ-বৌকে যদি তুমি চিনতে, তা হ'লে একথা বলতে না।"

ব'লেই জোরে জোরে উঠান নিকোয়। শাশুড়ী বড়-বৌর রাগ বুঝতে পারে। অন্যদিন বৌ এইরকম করে কথা বললে সে হয়ত লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলত। কিন্তু আজ সে সব সয়ে যেতে লাগল। তার বৌ পর হয়ে যাবে না, এই খুশি আজ যেন তার ধরছিল না। তাই আজ বৌ-এর বকুনিও অদ্ভুত মিষ্টি শোনাতে লাগল তার কানে।

কিন্তু আজ অনেক-কিছু শুনেও যে এসেছে সে পাড়াতে—তা সত্যিই

হোক আর মিথ্যেই হোক। কাজেই পরিপূর্ণ সোয়াস্তি সে পাচ্ছিল না। এও জানত সে যে, মেজ-বৌকে এর বেশি জিজ্ঞেস করতে গেলে সে হয়ত এখ্‌খুনি বাপের বাড়ীই চ'লে যাবে। রায়-বাঘিনী শাশুড়ী সে, বৌদেরে কথায় কথায় 'নাকের জলে চোখের জলে' করে। কিন্তু মেজ-বৌকে কেন যে তার এত ভয়, কেন যে ওকে আর বৌদের মত ক'রে গালমন্দ দিতে পারে না, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

মেজ-বৌর দু-দুটো ছেলেমেয়ে হ'লেও তার শরীরের বাঁধুনি দেখে আজও আইবুড়ো মেয়ে ব'লেই ভ্রম হয়। বিধবা সে, তবু পান ত খায়ই, দু-একদিন চুড়িও পরে—রঙীন রেশমী চুড়ি। আবার তার পরের দিনই ভেঙে দেয়। কাপড়টাও তার পরবার ঢং একটু 'খেরেস্তানী' ধরণের। সিঁথিটা সে সোজাই কাটে হয়ত; মেয়েরা কিন্তু বলে, ও বাঁকা সিঁথি কাটে। খোঁপায় তার মাঝে মাঝে গাঁদা ও দোপাটি ফুলের গুচ্ছও দেখা যায়। হাসি ত লেগেই আছে ঠোঁটে, তার ওপর দিনরাত গুনগুন করে গান।

তবু পাড়ার কেউ ওর নামে বদ্‌নাম দিতে সাহস করেনি আজও। ও যেন পাড়ার ছেলেমেয়ে সব্বারই আদরের দুলালী মেয়ে।

শাশুড়ী যখন-তখন যার-তার কাছে বলে, "মা গো, আমি যেন আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে আছি।"

মেজ-বৌ সত্যিই যেন আগুনের খাপরা। রূপ ওর আগুনের শিখার মতই লকলক্ করে। কিন্তু ধরতে গেলে হাতও পোড়ে। ঐ হাত পোড়ার ভয়েই হয়ত পাড়ার মুখপোড়ারা ওদিকে হাত বাড়াতে সাহস করে না।

ও যেন বসরা-গোলাবের লতা। শাখা ভরা ফুল, পাতা ভরা কাঁটা।

ও যেন বোবা টাকা। শুধু রূপো, খাদ নেই। বাজাতে গেলে বাজে না। লোকে জানে, ও টাকা দিয়ে সংসার চলে না। খুব জোর, গলায় তাবিজ ক'রে রাখা যায়!...

কিন্তু এ নেকার জনরবটা নিছক মিথ্যা নয়।

মেজ-বৌর বোনের সোয়ামী সত্যিই বড়লোক—কল্‌কাতার চামড়া-ওয়ালা। আগে তার নাম ছিল ঘাসু মিঞা, এখন সে ঘিয়াসুদ্দিন আহমদ। পূর্ব্বে সে ঘোড়ার গাড়ী চালাত, এখন ঘোড়ার গাড়ীই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

'ঘিয়াসুদ্দীন' নামে প্রমোশন পেয়ে যাওয়ার পর থেকে সে আর শশুর-বাড়ী মাড়ায় নি। স্ত্রী তার চির-রোগী। কাজেই বিয়ে তাকে আরও দুটো কর্‌তে হয়েছে। সে বলে, এক বিবিতে ইজ্জত থাকে না লোকের কাছে। তার শালী—অর্থাৎ মেজ-বৌকে সে আগেই দেখেছিল। কাজেই মেজ-বৌ বিধবা হবার পর থেকেই তার শ্বশুর-বাড়ীর দিকে টানটা আবার নতুন ক'রে আরম্ভ হয়েছে।

বড়লোক জামাইকে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ী খুশির চেয়ে সন্ত্রস্তই হয়ে ওঠে বেশি। নিজেদের দারিদ্র্যের লজ্জায় সর্ব্বদা যেন এতটুকু হ'য়ে যায় জামাইয়ের কাছে। অবশ্য বাইরে এ নিয়ে বারফট্টাই কর্‌তেও ছাড়ে না।

মেজ-বৌর বাপের বাড়ী শ্বশুর-বাড়ীর একটু দূরেই কুড়্‌চি-পোতায়। কাজেই সে যখন ইচ্ছা বাপের বাড়ী চলে যায়। শাশুড়ী এতে মনঃক্ষুন্ন হ'লেও জোর ক'রে কিছু বলতে পারে না। ওর সর্ব্বদা ভয়, বেশি টান দিলেই বুঝি এই ক্ষীণ সুতোটুকু ছিঁড়ে যাবে।

শাশুড়ীতে মেজো বৌয়ে যেন ঘুড়ি খেলা চলেছে। মেজ-বৌ খেলে বেড়ায় মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে। শাশুড়ী মনে করে, হাতের বন্ধন এড়িয়ে ও চলে যেতে চায় সুতো ছিঁড়ে। তাই বাতাস যত জোর বয়, ও তত সুতো চেপে না ধ'রে সুতো ছেড়েই দিতে থাকে! কিন্তু ও সুতোরও শেষ আছে। তা ছাড়া ঐ পচা সুতোর জোরই বা কতটুকু —তাও ত অজানা নেই ওর। তাই তার অসোয়াস্তির আর অন্ত নেই।

অন্য বউদের নিয়ে সে ভয় নেই বলেই সে ওদের ওপর অত নির্মম হ'তে পারে।

রূপের একটা মোহ আছে। ওতে যে শুধু পুরুষই মুগ্ধ হয় তা নয়, দজ্জাল মেয়েও রূপের আঁচে না গলুক, নরম হয়ে পড়ে অনেকটা।

বাড়ীর পশুপক্ষীগুলো পর্য্যন্ত যেন ওর আকর্ষণ অনুভব করে। ওদের একটা গাই ছিল, দুঃখে প'ড়ে তাকে বিক্রি ক'রে দিতে হয়েছে,—সে মেজ-বৌ ছাড়া আর কারুর হাতে সহজে খেতে চাইত না।

গরুরও বোধ-শক্তি আছে কি না জানি না, কিন্তু যেদিন ধলী গাইটাকে কিনে নিয়ে গেল ও-পাড়ার রেমো, সেদিন মেজ-বৌ আর ধলী দুইজনার চোখেই জল দেখা গেছিল। আজও প্রায়ই পালিয়ে আসে গাইটা। সারা রাস্তাটা যে রকম ছুটতে ছুটতে আর ডাক্‌তে ডাক্‌তে আসে সে, তা দেখে ওবাড়ীর সবারই চোখ অশ্রু-সিক্ত হয়ে ওঠে! এসেই মেজ-বৌকে দেখে সে কি আকুল-বিকুলি ঐ অবলা পশুর! গা হাত চেঁটে, চারপাশে ঘু'রে তার যেন আর সাধ মেটে না।

বড়বৌ বলে, "মেজবৌ, তুই যাদু জানিস্।

যেদিন ঘিয়াসুদ্দিন কুড়্‌চি পোতা আস্‌ত, সেই দিনই মেজ-বৌকে

নিয়ে যাবার জন্য তার মা ধন্না দিয়ে বস্‌ত এসে। বেয়ানে বেয়ানে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে যেত। মায়ের কান্নায় মেজ-বৌ না গিয়ে পারত না। এই নিতে আসার উদ্দেশ্যও সে বুঝ্‌ত। কিন্তু ওর ঐ রহস্যভরা স্বভাবটুকুর জন্যই সে হয়ত বা ইচ্ছা করেই যেত।

বড়-বৌ হেসে বল্‌ত, "আবার আসবি ত মেজো?" মেজ-বৌ হেসে বল্‌ত, "জোড়ে ফিরব বুবু।"

(৮)

সেদিন ঘিয়াসুদ্দিন শ্বশুর-বাড়ী এসেছে। মেজ-বৌও বোনাইকে দেখ্‌তে এসেছে। ওই এসেছে কিম্বা ওর বোনাই-ই আনিয়েছে—এই দুটোর একটা কিছু হবে।

আগুন আর সাপ নিয়ে খেলা করতেই যেন ওর সাধ। ঘিয়াসুদ্দিন ওকে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না ব'লেই এত ঘন ঘন আসে। মেজবৌও তা বোঝে, তাই তাকে ঘন ঘন আসায় অর্থাৎ আসতে বাধ্য করে।

সে বলে, "দুলা-ভাই, তুমি তোমার গাড়ীতে চড়ালে না আমায় ?"

ঘিয়াসুদ্দিন যেন হাতে চাঁদ পেয়ে বলে, "এ নসিবে কি তা আর হবে বিবি ? আমার গাড়ী ত তৈরিই, তুমি চড়লে না ব'লেই ত তা রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

মেজ-বৌ মুচ্‌কি হাসে। হাসি ত নয়, যেন দু-ফলা চাকু। বুকে আর চোখে দুই জায়গায় গিয়ে বেঁধে বলে, "অর্থাৎ আমি গাড়ীতে উঠলেই গাড়ী তুল্‌বে আস্তাবলে ! বুবুকে যেমন তুলেছ !"

ঘিয়াসুদ্দিন হঠাৎ থ' বনে যায়। বে-বাগ ঘোড়া হঠাৎ মুখের উপর চাবুক খেয়ে যেমন থতমত খেয়ে যায় তেমনি !

একটু সাম্‌লে নিয়ে সে বলে, "আরে তৌবা, তৌবা! ওকি বদ্‌রসিকের মত কথা বল ভাই। আস্তাবলে কেন, গাড়ীশুদ্ধ মাথার ওপরে তুল্‌ব তোমায়। তোমার বুবু ত বুকে আছেনই।"

মেজ-বৌ বোনাই-এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "আমায় রাখবে একেবারে মাথায়! এই ত? কিন্তু দুলা-ভাই, তোমাদের মাথা কি সব সময় ঠিক থাকে যে, ওখানে চিরদিন থাক্‌ব? আরো দু-দুজনকে ত মাথায় তুলে শেষে পায়ের তলায় নামিয়ে রেখেছ!"

ঘিয়াসুদ্দিনও হট্‌বার পাত্র নয়। সে মরিয়া হয়ে বলে উঠল, "কিন্তু ভাই, ওরা হ'ল মুনের বস্তা, বেশি দিন কি মাথায় রাখা যায়? তুমি হ'লে মাথার তাজ, তোমাকে কি তাই ব'লে মাথায় থেকে নামানো যাবে?"

মেজ-বৌ একটু তেড়ছা হাসি হেসে কণ্ঠস্বরে মধু-বিষ দু-ই মিশিয়ে বলে উঠল, "জি হাঁ, যা বলেছেন! কিন্তু ও পাকা চুলে আর তাজ মানাবে না দুলা-ভাই! বরং সাদা নয়ানসুকের কিস্‌তি-নামা টুপি পর, খাসা মানাবে!" ব'লেই হি হি ক'রে হাসে।

ঘিয়াসুদ্দিন ঘেমে উঠতে থাকে। কিসের যেন অসহ্য উত্তাপ অনুভব করে সারা দেহে মনে।

মেজ-বৌ তখনো বান ছুঁড়তে থাকে। শিকারী যেমন ক'রে আহত শিকার না মরা পর্য্যন্ত বান ছুঁড়তে বিরত হয় না।

সে বলে, "পুরুষগুলো যেন আমাদের হাতের গালার চুড়ি। ভাঙতেও যতক্ষণ, গড়তেও ততক্ষণ!"

ঘিয়াসুদ্দিন কী বল্‌তে কী ব'লে ফেলে। খেই হারিয়ে যায় কথার। বলে, "আচ্ছা ভাই, তুমি মাথায় না-ই চড়লে, পিঠে চড়তে রাজী ত?"

মেজ-বৌ এইবার হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলে, "হ্যাঁ, তাতে রাজী আছি। যদি চাবুক পাই হাতে!" ব'লেই বলে, "সেদিন বাবুদের বাড়ীতে কলের গানে একটা গান শুনেছিলাম দুলা-ভাই," ব'লেই সুর ক'রে গায়—

"আমার বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে।"

তারপর গান থামিয়ে বলে, "বুবু আছেন বুকে, এর পর আমি চড়্‌ব পিঠে, তা হ'লে তোমার অবস্থা ঐ সেঁটে ধরার মতই হবে যে! তা ছাড়া, জান ত, একজন বুকে বসে থাকলে আর একজন পিঠে চড়তে পারে না!"

গান শুনে মেজ-বৌর বড় ভাবি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে এইবার ব'লে উঠল, "কি লো, বোনাই-এর সাথে যে হাবুডুবু খাচ্ছিস্‌ রসে?"

ঘিয়াসুদ্দিন এতক্ষণে যেন কুলের দেখা পেলে বড় শালাজ্‌কে পেয়ে। এইবার সে অনেকটা সপ্রতিভ হ'য়ে বল্‌লে, "বাবা, ন'দের মেয়ে ডাক-সাইটে মেয়ে, এদেশে রসিকতা ক'রে পার পাবার যো আছে? ভাগ্যিস্‌ এসে পড়েছ ভাবি, নৈলে, এখুনি ডুবে মরেছিলাম আর কি!"

মেজ-বৌ তার ভাবির দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বল্‌লে, "কোথায় ডুবেছিলে, খানায়, না সার-কুঁড়ে?—কিন্তু অত ভরসা ক'রো না দুলা-ভাই, ও কলার ভেলা। ডুবোতে বেশি দেরি লাগবে না।"

ঘিয়াসুদ্দিন হতাশ হ'য়ে তক্তাপোশে চিৎপাৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে বল্‌ল, "না ভাবি, কোনো আশা নেই।"

ভাবি হাসতে হাসতে ব'লে চলে গেল, "অত অল্পে হতাশ হ'তে

নেই ভাই পুরুষ মানুষের। যেখানে শক্ত মাটী, সেখানে একটু বেশি না খুঁড়লে পানি পাওয়া যায় না।"

মেজ-বৌ কিছু না ব'লে তামাক সেজে ঘিয়াসুদ্দিনের হাতে হুকো দিয়ে বল্‌লে, "এইবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও দেখি একটুকু, সব পরিষ্কার দেখতে পাবে।"

ঘিয়াসুদ্দিন হুকোটা হাতে নিয়ে একবার করুণ নয়নে মেজ-বৌর পানে চেয়ে বল্‌লে, "যথেষ্ট পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি ভাই। ধোঁওয়া হ'য়ে রইলে কিন্তু তুমিই !"

ব'লেই জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হুকোয় মন দিলে।

মেজ-বৌ কৌতুক-ভরা চোখে একবার বোনাই-এর পানে চেয়ে, উঠ্‌বার উপক্রম করতেই ঘিয়াসুদ্দিন হঠাৎ সোজা হ'য়ে ব'সে বল্‌লে, "একটু দাঁড়াও ভাই, একটা কাজ আছে !" ব'লেই তার হাতের কাছের বাক্‌সটা হ'তে একখানি সুন্দর ঢাকাই শাড়ী বে'র ক'রে বললে, "এইটে তোমায় নিতে হবে ভাই !"

মেজ-বৌ শাড়ীটার দিকে কটাক্ষে চেয়ে হেসে বল্‌লে, "আগে থেকেই কাপড়ের পর্দ্দা ফেলে দিলে বুঝি ? কিন্তু এ যে ঢাকাই কাপড় দুলা-ভাই, বড্ডো পাত্‌লা। আমি যে বিধবা, সে ঘা ত এ পাত্‌লা কাপড়ে ঢাকা পড়বে না।"

বলেই মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছে চলে গেল। ঘিয়াসুদ্দিনের হাতের কাপড় হাতেই রয়ে গেল।

একটু পরেই মেজ-বৌ হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "ও কি দুলা ভাই, তুমি এখনও কাপড় হাতে ক'রে ব'সে আছ ? দাও দাও, মন

খারাপ কর্‌তে হবে না।” ব’লেই কাপড়খানি হাতে নিয়ে গুন্ গুন্ ক’রে গান কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে গেল—“তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে আমায় ধর্‌তে পারলি না।”

একটু পরেই উঠোনে মেজ-বৌর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “না ভাবি, আজ আসি! শাশুড়ী বোধ হয় এতক্ষণ তাঁর মরা ছেলেকে নালিশ কর্‌ছেন আমার নামে। ও কাপড়টা তোমায় দিলাম। এ পোড়া গায়ে কি অত রং চড়াতে আছে? চ’টে যাবে।—বিনি রঙেই কত বুড়োর চোখ গেল ঝল্‌সে, রং চড়ালে না জানি কী হবে।” ব’লেই বোনাই-এর ঘরের পানে তাকায়। তারপর ছেলেমেয়ে দুটির হাত ধ’রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সারা পথ তার পায়ের তলায় কাঁদ্‌তে থাকে।

(৯)

সেদিন বড়-বৌ, প্যাঁকালে, তার মা আর পাঁচিতে মিলে একটা গোপন পরামর্শ-সভা বসেছিল।

প্যাঁকালে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে, "আমি তা কখনও পারব না। আমি কালই চল্‌লাম রাণাঘাট। সেখেনে রোজ চোদ্দ আনা ক'রে পয়সা পাব।"

তার মা অনুনয়ের স্বরে বল্‌লে, "রাগ করিস্ কেন বাবা? এমন ত সব গরীব ঘরেই হচ্ছে আমাদের। তা ছাড়া ওর চাঁদপানা মুখ যে কিছুতেই ভুল্‌তে পারিনে। অমন বউ পর হয়ে যাবে। আমার কপালই যদি না পুড়বে, তা হ'লে সোভানই বা মরবে কেন, আর তোকেই বা এ উপরোধ কর্‌তে যাব কেন?"

পাঁচি মায়ের কথায় সায় দিয়ে ব'লে উঠল, "তা ভাই তোমার এক আশ্চয্যি লজ্জা! অমন ত কতই হচ্ছে! একদিন ভাবি বলেছ ব'লে বুঝি আর ইয়ে কর্‌তে নেই! দুদিন বাধ্‌বে, তা'পর আপ্‌নি সব্‌গড় হয়ে যাবে দেখে নিও।"

প্যাঁকালে দাঁত খিঁচিয়ে ব'লে উঠল, তুই থাম পাঁচি। যা লয় তাই। তুই তবে কেনে নিকে কর্‌লিনে তোর ভাসুরকে?"

পাঁচ ছেলের মা হ'লেও তার ছেলেমানুষী করার বয়স আজো যায়নি। তার ভাসুরকে নিকে করার ইঙ্গিত শুনে সে একেবারে তেলে বেগুনে হয়ে ব'লে উঠল, "তা ইখেনে নিকে করবে কেনে, কুর্শিকে যে বিয়ে করবে খেরেস্তান হয়ে!"

প্যাঁকালে রেগে উঠে যেতে যেতে বললে, "রইল তোর নিকে। আমি চললুম।" ব'লেই বেরিয়ে গেল!

বড়-বৌ বললে. "তখনি বলেছিলাম মা, যে, এ হয় না। তা ছাড়া, তোমার ছেলে রাজী হ'লেও সে যা মেয়ে—সে কিছুতে রাজী হ'ত না।"

শাশুড়ী মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "কপাল মা! কি করবি বল্! ঐ বুড়ো মিন্‌সেই ছিল ছুঁড়ির কপালে!" ব'লেই তার সোভানকে উদ্দেশ ক'রে কান্না জুড়ে দিলে।

বড়-বৌ একটু রেগেই বললে, "তোমারি মা বাড়াবাড়ি! জান যে মেজ-বৌ ও নিকেতে রাজী নয়, তবু ঐ নিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি। তুমিই তাড়াবে এমনি ক'রে মেজ-বৌকে।"

এমন সময় মেজ-বৌ তার বাপের বাড়ী থেকে এসে পৌছল। বড়-বৌ হেসে বললে, "কি লো, জোড়ে ফিরলি, না বিজোড়ে?"

মেজ-বৌ বড়-বৌর রহস্যের উত্তর না দিয়ে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, "তা তোমরা যে-রকম ক'রে তুলছ অবস্থা, তাতে জোড়াই খুঁজে নিতে হবে দেখছি আমায়?" ব'লেই শাশুড়ীর দিকে চেয়ে বললে, "মাগো মা! পাড়ায় ঢি-ঢিক্কার প'ড়ে গেল এই নিয়ে। কেলেঙ্কারীর আর বাকি রইল না। আচ্ছা মা, এমনি ক'রে তুমি আমায় দেশ-ছাড়া করতে চাও নাকি? তুমি জান, আমার বোন বেঁচে রয়েছে আজো।

এক বোন বেঁচে থাকতে আর এক বোনকে নিকে করা যায় কি-না, যাও মৌলবী সায়েবকে জিজ্ঞেস ক'রে এসো ?" ব'লেই দাওয়ায় ব'সে প'ড়ে পা দুলোতে লাগল। ছোট মেয়ে রাগলে যেমন করে।

বড়-বৌ খুশি হ'য়ে ব'লে উঠল, "ঠিক বলেছিস মেজ-বৌ। দেখ ও কথাটা আমাদের কারুর মনেই ছিল না যে এক বোন থাকতে আর এক বোনকে নিকে করা যায় না। সত্যি মেজ-বৌ, তোর না-জানা কিছু নেই দেখছি। আমাদের হাফেজ সায়েব হার মেনে যায় তোর কাছে।" বলেই মেজ-বৌ কোন্ দিন কোন্ বিষয়ে কি ফতোয়া দিয়েছিল, তারই সালঙ্কার বর্ণনা শুরু ক'রে দিলে।

তার শাশুড়ীর কিন্তু সন্দেহ আর ঘোচে না। সে কান্না থামিয়ে ব'লে উঠল, "তুই থাম্ বড়-বৌ, অমন অনেক দেখেছি। কতজনা আমাদের চোখের সামনে এক বোনকে তালাক দিয়ে আর এক বোনকে নিকে করল। ও মুখপোড়া মিন্‌সের মেজ-বৌর বড় বোনকে তালাক দিতে কতক্ষণ ?" ব'লেই কান্নার জের চালায়।

মেজ-বৌর খোকাটি রোজকার মত কান্না থামাতে যায়, "দাদি গো, চুপ কর্।" মেজ-বৌ ছেলেকে হাত ধ'রে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। বলে, "তোর বাবা-কেলে দাদি! পোড়ারমুখো! সব তাতেই ফফর-দালালি!"

খোকা ছেলেবেলা থেকেই দাদি-ন্যাওটা। যত মার খায়, তত বলে "ও দাদি গো, আমায় মেরে ফেললে।"

বৃদ্ধা বৌ-এর কাছ থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে মেজ-বৌর বাপ-মাকে গাল দিতে থাকে। তারপর আঁচল দিয়ে খোকার চোখ মুছিয়ে

দিতে দিতে বলে, "দেখ, বড়-বৌ, সোভান ঠিক এমনটি দেখতে ছিল ছেলেবেলায়, ঠিক এমনি ক'রে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদত। ঠিক তেমনি

বড়-বৌ বলে, "ওর কপালের ঐখেনটা কিন্তু ওর বড় চাচার মত নয় মেজ-বৌ?"

মেজ-বৌ কথা কয় না। দাওয়ায় ব'সে আনমনে পা দোলায় আর চাপাস্বরে গান করে।

সেজ-বৌ পাশ ফিরে কাশতে থাকে। মনে হয়, ওর প্রাণ গলায় ঠেকেছে এসে। কবর দেবার জন্য বাঁশ কাটার শব্দটা যেমন ভীষণ করুণ শোনায়, তেমনি তার কাশির শব্দ।

তার পাশে শিশু আর কাঁদতে পারে না। কেবল ধুঁকতে থাকে! যেন মৃত্যুর পাখার শব্দ।

এরি মধ্যে হঠাৎ একদিন একপাল ছেলেমেয়ে চীৎকার করতে করতে ঘরে এসে বললে, "ওগো, তোমাদের বাড়ীতে পাদরী সায়েব আর মেম আসছে?" বাড়ীশুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সত্যিসত্যিই একজন পাদরী সায়েব, সঙ্গে একজন নার্স নিয়ে ঘরে ঢুকল এসে। বৌ-ঝিরা ঘরে ঢুকে পড়ল। শুধু প্যাঁকালের মা হতভম্বের মত চেয়ে রইল সায়েবের মুখের দিকে।

সায়েব বাঙলা ভালই বলতে পারে। বললে, "তোমরা ভয় করবে না। হামি টোমাদিগের কষ্ট শুনিয়া আসিয়াছে। টোমাডের কে পীরিট আছে, টাহাকে ঔষড ডিবে।"

প্যাঁকালের মা একটু মুশকিলেই পড়ল প্রথমে। পরে আমতাআমতা ক'রে বললে, "খোদা তোমার ভাল করবেন সায়েব। ঐ আমার বৌ আর তার খোকা শুয়ে। দেখ, যদি ভাল করতে পার। কেনা হয়ে থাকব তাহলে?"

সায়েব খুশি হ'য়ে বললে, "কোনো চিন্‌টা নাই। যীশু বালো করিয়া ডেবে। যীশুকে প্রার্‌ঠনা করো।" তারপর এগিয়ে মাটীতেই ব'সে পড়ে শিশুকে পরীক্ষা করতে লাগল। সায়েব একজন ভাল ডাক্তার।

নার্সকে ইংরিজিতে কী ইঙ্গিত ক'রে সায়েব বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। মুখ তার বিষণ্ণ গম্ভীর।

নার্স সেজ-বৌকে পরীক্ষা করতে লাগল। নার্সের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর দু'জনে বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বলা-কওয়া করলে কী-সব। তারপর প্যাঁকালের মাকে ডেকে কতকগুলো ওষুধ দিয়ে খাওয়াবার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চ'লে গেল। বলে গেল, আবার এসে দেখে যাবে বিকেলে।

প্যাঁকালের মা খুশিতে প্রায় কেঁদে ফেললে। বললে, "ছুঁড়ির কপাল ভাল মেজ-বৌ, এত সব ওষুধ খেয়ে ও কি আর মরে? হেদে দেখ, কতগুলোন ওষুধ দিয়েছে।"

মেজ-বৌ বললে, "মেম সায়েব যাবার বেলায় একটা টাকা দিয়ে গেছে, সেজ-বৌর পথ্যি কিনতে। বলছে, বেদানার রস খাওয়াতে।" বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জলের ফোঁটা ঝ'রে পড়তে লাগল। মেজ-বৌ কাঁদতে লাগল, "কপালে এত দুক্কুও লিখেছিলেন আল্লা। সেজ-বৌর যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় কিনে দুটো আঙুর কি একটা বেদানা দিতে পারলুম না। শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝেঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গোঁয়াত-কুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়।"

শাশুড়ীও কেঁদে বলে, "যা বলেছিস মা।"

(১০)

সেদিন রবিবার। ছুটি।

প্যাকালে গোটা দুয়েকের সময় স্নান করতে বেরুল।

বেরুবার আগে তেলের শূন্য শিশিটা অনেকক্ষণ ধ'রে উলটে' রাখলে হাতের তালুর উপর। মিনিট পাঁচেকে ফোঁটা পাঁচেক তেল পড়ল। তেল ঠিক নয়, তেলের কাই। শিশিটার পিছন দিকে গোটা দুতিন থাপ্পড় মেরেও যখন আর এক ফোঁটার বেশি তেল গড়াল না, তখন তাই কোনো রকমে মুখে হাতে মাখতে মাখতে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

ঐ তেলটুকু মাথায় সে দিলে না,—নিজের মাথাকে তেলা-মাথা মনে ক'রেই কি না—বিশ্ব-সংসারে তেলামাথায় তেল দেওয়ার সব চেয়ে বড় মালিক যিনি তিনিই জানেন।

গামছা তাকে বলা যায় না—একটা তেলচিটে ন্যাকড়া, তাই সে মাথায় জড়িয়ে নিলে শৌখিন বাবুদের মাথায় রুমালের বাঁধার মত ক'রে। তাতে তাঁহার কপালের দুঃখটুকু ছাড়া মাথার বাকি সবটুকুই কোন রকমে ঢাকা পড়ল!

এই সৌভাগ্যের জয়ধ্বজা মাথায় বেঁধে প্যাকালে স্নান করতে চলল—ক্রিশ্চান পাড়ার ভিতর দিয়ে! মোংলা পুকুরই তার কাছে হয়, কিন্তু কেন যে সে অতটা ঘুরে গোলপুকুরে নাইতে যায়, তা

আর লুকা-ছাপা নেই—ও-পুকুরে নাইতে যারা যায় তাদের কাছে। প্রেমের পথ সোজা নয় ব'লেই হয় ত সোজা পথে যায় না।

লোকে বলে মাথার জয়ধ্বজা তার মধু ঘরামির অর্ধেক রাজত্বের ওপর দাবি বসাবার জন্য নয়, তার 'রাজকন্যা' কুর্শিকে জয় করার জন্যই। কিন্তু ঐ জয়ধ্বজার অসম্মানে সে নিজেই ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতে থাকে– যখন কুর্শির সামনেই ঐ জয়ধ্বজা দিয়ে গা রগড়াতে হয়।

নাইতে গেলে সে কুর্শিদের ঘরের সামনে দিয়েই যায়। আজও যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে ঘরে আগড় দেওয়া দেখে ব'সে পড়ল—রাস্তায় নয়—রোতো কামারের দোকানে।

রোতো তার হাপর ঠেলতে ঠেলতে তাকে একবার আড় নয়নে দেখে নিলে। মনে হ'ল, লোহা পেটার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন হাসি গোপন করছে।

প্যাঁকালে রোতোর চেয়েও বেশি ঘামতে লাগল, আগুন হ'তে অনেক দূরে থেকেও।

রোতো নেহাই-এর উপর একটা জলন্ত লোহার ফাল রেখে প্যাঁকালের দিকে চেয়ে বললে, "দেখেছিস মাইরি, আগুন নিয়ে খেলার ঠেলা! হাতের কতটা পুড়ে গিয়েছে ছাখ্!" বলেই প্রাণপণে হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটায় আর হাসে। প্যাঁকালে বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে।

রোতো ফলাটা আবার আগুনে সেঁদিয়ে দিয়ে হাপর ঠেলতে ঠেলতে বলে, "মেয়েমানুষ আর আগুন—এই দু-ই সমান, বুঝলি? দু-টাতেই হাত পোড়ে।"

এতক্ষণ কুর্শি কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সে-ই জানে; হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "মুখও পোড়ে রে মুখপোড়া।"

প্যাঁকালে তাড়াতাড়ি উঠে পুকুরের দিকে চ'লে গেল। তখনও রোতোর স্বর শোনা যাচ্ছিল, "উ—ই প্যাঁকালে রে! তুই একটু আমার হাপরটা ঠেল্ ভাই, আমি একটু জলে ডুবে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসি!"

কুর্শি কতকগুলো সাজি-মাটি-সেদ্ধ কাপড়ের বোঝা নিয়ে পুকুরের দিকে যেতে যেতে একবার টেরা চাউনি দিয়ে অভ্যর্থনা করে গেল রোতোকে। যাবার সময় ব'লেও গেল, "যাস্‌নে মিন্‌সে, এক্কেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাবি। জলে ডুবলে আর উঠতে হবে না।"

রোতো হয় ত তখন মনে মনে বলছিল, এ আগুনের তাতে মরার চেয়েও শীতল জলে ডুবে মরায় ঢের আরাম।

রোতোর কিন্তু হাতই পুড়েছে, কপাল পোড়েনি। কুর্শি তাকে দেখতে না পারলেও ঘেন্নাও করে না।

গোলপুকুরে অন্য যারা চান করে, তাদের কেউই এ অসময়ে—বেলা দুটোয় চান করতে আসে না। কাজেই এই সময়টাই তাদের পক্ষে প্রশস্ত, যারা শুধু গা ধুতেই আসে না, প্রাণ জুড়াতেও আসে।

কুর্শি এসে দেখে, প্যাঁকালে তখন ঘাটের বটগাছটার শিকড়ের উপর ব'সে সিগারেট টানছে! প্যাঁকালে মাঝে মাঝে থিয়েটারের ইয়ার বাবুদের কাছে দু-একটা সিগারেট চেয়ে রাখে এবং সেটা কুর্শির কাছ ছাড়া আর কারুর কাছেই খায় না। আজও স্নান করতে আসার সময় কালকের চাওয়া-সিগারেটটা কোঁচড়ে গুঁজে আনতে ভোলেনি।

কুর্শি প্যাঁকালের দিকে না চেয়েই ঘাটে ধপাস্ ক'রে কাপড়ের

রাশ আর পিঁড়িটা ফেলে বেশ ক'রে কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে নিলে। তারপর কারুর দিকে না চেয়ে জোরে জোরেই বলতে লাগল, "ঘাটের মড়া! রোজ রোজ আমার পেছনে লাগবে! দেবো একদিন মুখে বাসি চুলোর ছাই ঢেলে, তখন বুঝবে মজাটা।"

প্যাঁকালে আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। এ উত্তুরে হাওয়া তার দিকে না রোতোর দিকে বইছে, তাও সে বুঝতে পারলে না। সে ফস্ ক'রে নেমে এসে পাশের ঘাটের পচা খেজুর গুঁড়িটাতে ব'সে একটা খোলামকুচি নিয়ে পায়ের মরা মাস ঘসতে ঘসতে বললে, "তুই আজ রাগ করেছিস না কি কুর্শি? দেখছিসই ত, শালারা কী রকম চোখ লাগাতে শুরু করেছে!

কুর্শি একটা কাপড় একটু ভিজিয়ে কাচবার জন্য দাঁড়িয়ে বলে, "বয়ে গেছে আমার! এখন তোর কুর্শিকে না হ'লেও চলবে। তোর ঐ মেজ-ভাবী ত আমার মতন কালো নয়। তা হোক না ছেলের মা।"

এইবার প্যাঁকালে হাওয়ার কতকটা দিক-নির্ণয় করতে পারলে। পা ঘসা থামিয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "আল্লার কিরে কুর্শি, খোদার কসম, আমি ও নিকে করছিনে। আমাকে করেছিল মা, তা আমি আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি মুখের মতন। আমি বলেছি, এ শালার গোয়াড়িতেই থাকব না। রাণাঘাট চ'লে যাব কাজ করতে।"

কুর্শির হাতের কাপড় জলে পড়ে গেল। সে মুখ ম্লান ক'রে বললে, "সত্যি চলে যাবে নাকি?"

ওষুধ ধরেছে দেখে প্যাঁকালে খুশি হ'য়ে ব'লে উঠল, "যাবই ত। তা না হ'লে যদি মেজ-ভাবীর সঙ্গে নিকে দিয়ে দেয় ধরে?"

কুর্শি কাপড়টা তু'লে অনেক্ষণ ধরে কাচে। প্যাকালে তার কাপড় কাচার বিচিত্র গতিভঙ্গি চোখ পু'রে দেখে। চোখে তার ক্ষুধা আর মোহ নেশার মত ক'রে জমাট বেঁধে ওঠে। বুকের স্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর হ'তে থাকে। তার যেন নিজেরই নিজেকে ভয় করে। অকারণে পুকুরের চারপাশে ভীত ত্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখে—সে যেন কী চুরি করছে। মাথায় তার খুন চ'ড়ে যায়। সে উঠে গিয়ে কুর্শির হাত চেপে ধরে। পা তার ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে। চোখে কিসের শিখা লক্‌লক্ ক'রে ওঠে। সে শুষ্ক কণ্ঠে ডাকে, "কুর্শি!"

কুর্শি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, "যা মাইরি, এখুনি কেউ দেখে ফেলবে। একটু হুঁশ নেই!—আগে বল্, তুই রাণাঘাটে চলে যাবিনে।"

প্যাকালে সাহস পেয়ে বলে, "এই দেখ মজিদের দিকে মুখ করে বল্‌ছি, আল্লার কিরে কুর্শি, আমি যাব না কোথাও তুই না বল্‌লে।"

কুর্শি খুশি হয়ে বলে, উঁহু! আমার গা ছুঁয়ে বল্।"

প্যাকালে গা ছুঁয়ে বলে, "মজিদের চেয়েও বুঝি তুই বড় হলি?"

কুর্শি খুব মিষ্টি ক'রে হাসে। বলে, "হলুমই ত।" সে হাসিতে রাজা-বাদশা বিকিয়ে যায়। প্যাকালে থাকতে না পেরে একটা অতি বড় দুঃসাহসের কাজ ক'রে বসে।

কুর্শি খুশিও হয়, রাগও করে। মুখটা সরিয়ে দিয়ে বলে, "যা ভাল লাগে না। কেউ দেখে ফেলবে এখনি।

প্যাকালেও জানে, যে-কোন লোক যে-কোন সময়ে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু ঐ হাসি! ঐ চোখ! ঐ ঠোঁট! ঐ দেহের দোলান। দেখুকই না লোকেরা! প্যাকালে যেন মাতাল হয়ে পড়ে। হুঁশ্ থাকে না।

স্নান ক'রে সে বাড়ী ফেরে। সারা শরীর তার ঝিম-ঝিম্ করতে থাকে। যেন তাড়ি খেয়েছে। মাথার দুপাশের রগ টিপটিপ করে। বিশ্ব-সংসার মুছে যায় তার চোখের সামনে থেকে। সে কেবল ভীত মিষ্টি কণ্ঠের আকুলতা শোনে আর শোনে, "কেউ দেখে ফেলবে, দেখে ফেলবে।" তার তাকে লজ্জা নাই, লজ্জা শুধু দেখে ফেলার লোককে।

ওদের লজ্জা যেন ওদের জন্য নয়, অন্যের জন্য।

তারা দুজনে চলে—চির-চলা রক্ত-রাঙা পথে। যে-পথ ফরহাদ-মজনু, লায়লি-শিরী, গোলে-বকৌলি, মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক, আরো কত জনের বুকের রক্তে রাঙা হয়ে আছে। চির-যৌবনের চির-কণ্টকাকীর্ণ পথ। চিরকালের রোমিও-জুলিয়েট দুষ্মন্ত-শকুন্তলা যেন ওরা!

(১১)

"ঝড় আসে নিমেষের ভুলে!"

জীবনের কোন্ পথ দিয়ে কখন বিপর্যয় আসে, মুহূর্ত্তের জন্যে—নিমেষে সব ওলট পালট ক'রে দিয়ে যায়,—বন্ধনের দড়াদড়ি কখন যায় টুটে,—কেউ জানে না।

এক দীঘি ফোটা পদ্মবনের ওপর দিয়ে—ঝড় নয়—শুধু একটা ঘূর্ণি হাওয়ার চলে-যাওয়া দেখেছিলাম। সেই অসহায় পদ্ম-দীঘির স্মৃতি আজো ভুলিনি। হয়ত কখনো ভুলবও না। জলের ঢেউ তার তেমনি রইল—কিন্তু পদ্মবন গেল আগাগোড়া ওলট পালট হয়ে। কোথায় গেল রাঙা শতদলের সে শোভা, কোথায় উড়ে গেল তার পাশের মরাল-মরালী! শুধু কাঁটা-ভরা মৃণাল আর পদ্মের ছিন্নপত্র। ছিন্নদল পদ্মের পাপড়িতে দীঘির মুখ আর দেখাই যায় না।

ও যেন মূর্চ্ছিতা ত্রস্তকুন্তলা বিস্রস্ত-বসনা অভিমানিনী! ওকে কে যেন দু পায়ে দলে পিশে চলে গেছে।

নিমেষের ঝড়।...

ঘরে কাঁদে মেজ-বৌ, বাইরে কাঁদে কুশি। একজন ঘৃণায়, রাগে—আর একজন অভিমানে, বেদনায় অসহায় পীড়নে।

প্যাকালে কোথায় চলে গেছে।

মেজ-বৌ রাগে নিজের হাত নিজে কামড়ে মরে নিষ্ফল আক্রোশে। এই আবার পুরুষ, বেটাছেলে! এত বড় মিথ্যার ভয়কে সে উপেক্ষা করে চলতে পারল না! যে মিথ্যা কলঙ্কের ঢিল লোকে তাদের ছুঁড়ে মারলে, সেই ঢিল কুড়িয়ে সে তাদেরে ছুঁড়ে মারতে পারলে না। অন্তত অবহেলার হাসি হেসে বুক চিতিয়ে তাদেরি সামনে দিয়ে পথ চলতে পারল না। শেষে কি না পালিয়ে গেল! হার মেনে! কাপুরুষ! মেজ-বৌ ভাবে, আর কি একটা সঙ্কল্প করে। অমন সুন্দর মুখ পাথরের মূর্ত্তির মত কঠিন হয়ে ওঠে।

পুরুষ যেখানে হার মেনে পালিয়ে গেল, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধ করবে। মরবে, তবু হটবে না।

শাশুড়ী কাঁদে, বড়-বৌ হা-হুতাশ করে, ছেলেমেয়েরা রোজ সাঁঝে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। এমনি সন্ধ্যে হব-হব সময় সে আসত ঐ শিশুগুলির জন্যে একটা-না-একটা কিছু নিয়ে। কোনদিন 'লেবেঞ্চুস', কোনদিন বা বোয়াল মাছ।

মেজ-বৌর আনমনা ছেলেটি আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। তারপর আপন মনেই বলে, "তোমায় কিছু আনতে হবে না ছোট কাকা, তুমি অমনি এস।" মাকে বলে, "আচ্ছা মা, ছোট-চা বুঝি বা-জানের কাছে চলে গিয়েছে? উখেনে থেকে বুঝি আর ছেড়ে দেয় না?"

মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে। বলে, "বালাই! ষাট! উখেনে যাবে কেন? হুই রাণাঘাট চলে গেছে টাকা রোজগার করতে।"

শিশু থামে না। বলে, "রাণাঘাট বুঝি বা-জান যেখেনে থাকে, তার চেয়েও দূর? না মা?"

মা ছেলেকে ধুলোয় বসিয়ে দিয়ে উঠে যায়।

মস্‌জিদে সন্ধ্যার আজানের শব্দ কান্নার মত এসে কানে বাজে। ও যেন কেবলি স্মরণ করিয়ে দেয়—বেলা শেষ হয়ে এল, আর সময় নাই! ...পথ-মঞ্জিলের যাত্রী সশঙ্কিত হয়ে ওঠে!

সন্ধ্যার নামাজ—যেন মৃত দিবসের জানাজা সামনে রেখে তার আত্মার শেষ কল্যাণ-কামনা!

মেজ-বৌ পাগলের মত ছুটে গিয়ে মস্‌জিদের সিঁড়ির ওপর—"সেজদা" ত নয়—উপুড় হয়ে প'ড়ে মাথা কুটতে থাকে। চোখের জলে সিঁড়ির ধুলো পঙ্কিল হয়ে ওঠে—তার ললাটে তারই ছাপ এঁকে দেয়।

কী প্রার্থনা করে সে-ই জানে। ভিতর থেকে মৌলবী সাহেবের "তকবির" ধ্বনি ভেসে আসে, "আল্লাহো আকবর!" মেজ-বৌ সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে বলে, "আল্লাহো আকবর!" কান্নায় গলার কাছে আটকে যায় স্বর।

তারপর ঘরে এসে সব ছেলেমেয়েদের চুমু খায়, আদর করে—অভিভূতের মত। নিবিড় সান্ত্বনায় বুক ভ'রে ওঠে। মন কেবলি বলে, এবার আল্লা মুখ তুলে চাইবেন।

শাশুড়ীকে ডেকে বলে, "মা, আমি কা'ল থেকে নামাজ পড়ব।"

শাশুড়ী খুশি হয়ে বলে, "লক্ষ্মী মা আমার, পড়বি ত? আর কেউ নয় মা, শুধু তুই যদি খোদার কাছে হাত পেতে চাস্ খোদা আমাদের এ দুক্ষু রাখবে না—আমার প্যাঁকালে ফিরে আসবে। কই, এতদিন ত পড়ছি নামাজ, এত ত ডাকলাম, সে শুনল কই মা! কিন্তু তুই ডাকলে শুনবে!"

মেজ-বৌ খুশি হয়ে গান করে—অস্ফুট স্বরে।

শাশুড়ী ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, "মা, তুই ঐ গান ছেড়ে দে দিকিন্! ওতে আল্লা ব্যাজার হন। গান করলে 'গুনা' হয়, শুনিস্‌নি সেদিন মৌলবী সায়েবের কাছ থেকে?"

মেজ-বৌ হেসে বলে, "কিন্তু আমি যে ওতে খুশি হই মা। আমি খুশি হলে কি তিনি খুশি হন না? আচ্ছা মা, তুমি মৌলবী সায়েবকে জিজ্ঞেস করো ত গান করে তাকে ডাকলে, তাঁর কাছে কাঁদলে কি তিনি তা শোনেন না?

বড়-বৌ মুখ গম্ভীর করে বলে, "কোরান পড়ে না ডাকলে কি আল্লা শোনেন রে মেজ-বৌ?"

মেজ-বৌ হেসে ফেলে। তারপর আপন মনে আবার গুন্ গুন্ করে গান ধরে।

প্যাঁকালে যে দিন গভীর রাত্তিরে কাউকে কিছু না ব'লে চ'লে যায় —সেদিন বিকেল পর্য্যন্তও সে জানত না যে চলে যাবে।

সন্ধ্যায় সে ফিরছিল কাজ ক'রে। সারাদিনের ক্লান্ত চরণ তার কখন যে তাকে টেনে কুর্শির বাড়ীর সামনে নিয়ে এসেছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে সে সচকিত হয়ে দেখলে। বেড়ার-ওধারে কুর্শি, এধারে রোতো কামার। সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল পাশের আম গাছটার আড়ালে। রোতোর কি একটা কথার উত্তরে কুর্শি কচার একটা ছোট্ট কচি শাখা ভেঙে রোতোকে ছুঁড়ে মারলে, রোতোও হেসে হাতের একটা পান ছুঁড়ে মারলে কুর্শির বুক লক্ষ্য ক'রে।

রোতোর হাত-যশ আছে বলতে হবে। পানটা কুর্শির বুকেই গিয়ে পড়ল। কুর্শি নিমেষে সেটাকে লুফে নিয়ে মুখে পু'রে দিলে।

কিন্তু এরই মধ্যে চক্ষের পলকে কী যেন বিপর্য্যয় হয়ে গেল।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা কল্কি এসে লাগল কুর্শির বাম কানের ওপরে, ঠিক কপালের পাশে। কুর্শি "মাগো" ব'লে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফিনিক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

এর পর রোতোর আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

কুর্শি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। প্যাঁকালে কুর্শিকে পাথালি কোলে ক'রে - যেমন ক'রে বর তার রাঙা নববধূকে বাসি-বিয়ের দিন এক ঘর হ'তে আর এক ঘরে নিয়ে যায় তেমনি করে—বুকে জড়িয়ে তাদের বারান্দায় নিয়ে এল! বাড়ীর সকলে তখন বেরিয়ে গেছে কোথায় যেন।

বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর কুর্শি চোখ মেলে চাইলে। চেয়েই প্যাঁকালেকে দেখে আবার চক্ষু বুঁজে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁদে উঠল, "মা গো!"

প্যাঁকালে তার কোল থেকে কুর্শির মাথাটা একটা বালিশের ওপর রেখে উঠতে উঠতে বলল, "তোর বাবাকে বলিস্, আমি মেরেছি তোকে!" ব'লেই বেরিয়ে গেল—কুর্শির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার পশ্চাতে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল!

পরের দিন ঘুম হ'তে উঠেই কুর্শি শুনলে, প্যাঁকালে কোথায় চলে গেছে—ওদের বাড়ীতে মড়াকান্না পড়ে গেছে! শুনেই সে আবার মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ল!

কোথায় কী ক'রে লাগ্‌ল, হাজার চেষ্টা ক'রেও কুর্শির বাবা-মা জানতে পারলে না। কুর্শি কিছু বলে না, কেবল কাঁদে আর মূর্চ্ছা যায়! কিন্তু সেরে উঠতে তার খুব বেশি দিন লাগল না।

মাথার আঘাত তার যত শুকাতে লাগল, ততই তার মনে হ'তে লাগল, যেন ঐ কম্নিকের ঘা বুকে গিয়ে বেজেছে। সে রোজ দিন গণে আর ভাবে, আজ সে আসবেই। তার গা ছুঁয়ে দিব্যি করল যে দুদিন আগে, রাগের মাথায় সে চলেই যদি যায়, তা হ'লেও তার ফিরতে দেরি হবে না। এ অহঙ্কার তার আছে। আর রোতোর কথা? অমন বাজে ইয়ার্কি জোয়ান বয়সের ছেলে-মেয়ের দেখাশুনা হ'লেই ঢুটো হয়। আ মরণ! এ মিন্‌সেকে বুঝি সে ভালবাসতে গেল?

তারপরেই লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদে! বলে, ফিরে আয় তুই ফিরে আয়! তোরি দিব্যি ক'রে বলছি, ওর সঙ্গে ছুটো ইয়ার্কি দেওয়া ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ নাই আমার! ওকে আমি এতটুকুও ভালবাসিনে! আরো কত কি। ছেলেমানুষের মত যা মুখে আসে, তাই বলে যায় আর কাঁদে।

কিন্তু বেশি দিন এমন ক'রে যায় না। ফুল ফোটে, শুকায়, ঝ'রে পড়ে। হৃদয়ও ফোটে, শুকায়, তারপর দলিত হয় তারি পায়ে—যাকে সে কোন দিনই চায় নি।

এক মাস—দু মাস—তিন মাস যায়, প্যাঁকালে আর আসে না। তবে, খবর পাওয়া গেছে যে, সে কলকাতায় কাজ করছে—রাজমিস্ত্রিরই কাজ। দু'বার টাকাও পাঠিয়েছে বাড়ীতে।

কুর্শি একদিন মরিয়া হয়ে প্যাঁকালের বড় ভাবীকে জিজ্ঞেস করল—সে কখন আসবে এবং চিঠি পত্তর দেয় কি-না। বড়-বৌ মুখ বেঁকিয়ে

বললে, "কে জানে কখন আসবে!" কিন্তু এ খবরটা জানা গেল যে, চিঠিপত্তর মাঝে মাঝে দেয় বাড়ীতে!

কুর্শি আর শুনতে পারল না, মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

কিন্তু কিসের জন্য তার এত ক্ষোভ, তা সে নিজেই বুঝে না। কেবল অসহায়ের মত ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরে। চিঠি সে কেমন ক'রে দেবে তাকে, তা সে নিজেই ভেবে উঠতে পারে না। তবু রোজ মনে করে, বুঝি তার নামে আজ চিঠি আসবে। ক্রীশ্চান মেয়ে সে, মোটামুটি লেখাপড়া জানে, একটা চিঠিও হাতে কোনোরকমে লিখতে পারে। মাঝে মাঝে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসেও লিখতে। কিন্তু লিখেই তার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, মন যেন কেন বিষিয়ে ওঠে নিবিড় অভিমানে। লেখা কাগজ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে!

মাঝে মাঝে ভাবে, খুব কঠিন হয়ে থাকলে বুঝি সে না এসে পারবে না। তারপর দু-দিন তিনদিন মুখ ভার করে থাকে, রাস্তায় বেরোয়, গোলপুকুরে নাইতে যায় মুখ ভার ক'রেই,—সেখানে তিনটে বেজে যায়, কেউ আসে না। প্যাঁকালেদের ঘরের সামনে দিয়ে আসে যায়, এখন আর কেউ ফিরেও দেখে না। শুধু মেজ-বৌ তাকে দেখতে পেলে মুখ টিপে হাসে আর গান করে। কুর্শির শরীর মন যেন রি-রি-রি-রি-করতে থাকে রাগে।

এতদিন তার সয়েছিল এই ভেবে যে, হাজার হোক সে-ই ত অপরাধী। অমন ক'রে পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলে কার না রাগ হয়। ভাবতেই জিভ কেটে লজ্জায় সে যেন ম'রে যায়! সেও ত পর-পুরুষ! রোতো যেমন সেও ত তেমনি! বিয়ে তাদের হয়নি,

হ'তেও পারে না। তবু, মন-তার এমনি অবুঝ যে, সে কেবলি কী সব অসম্ভব দাবি ক'রে বসে তারই ওপর—বাইরের দিক থেকে যার ওপর কোনো দাবিই সে করতে পারে না।

কিন্তু যত বড়ই অপরাধ সে করুক, তারই গা ছুঁয়ে ত সে দিব্যি ক'রে বলেছিল যে, তাকে না বলে সে কোথাও যাবে না। সে না হয় কিছু না-ই হ'ল, ম'জিদের দিকে মুখ ক'রে দিব্যি করেছিল! এত বড় কী অপরাধ করেছে সে, সে প্যাঁকালে ম'জিদেরও অপমান করতে সাহস করে সেই অপরাধের জ্বালায়!

মন তার বেদনায় নিস্ফল ক্রন্দনে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে। যত মন জ্বালা ক'রে, তত বুক ব্যথা করে। সে বুঝি আর পারে না! রবিবার গির্জ্জায় গিয়ে কাতর স্বরে প্রার্থনা করে, "যীশু, তুমি আমায় খুব বড় একটা অসুখ দাও, যেন সে শুনেই ছুটে আসতে রাস্তা পায় না।"

শুকিয়ে সে যেতে লাগল দিন দিন, কিন্তু বড় কিছু অসুখও হ'ল না। প্যাঁকালেও এল না!

কুর্শি এইবার যেন মরিয়া হয়ে উঠল। এইবার সে যা-হোক একটা-কিছু করবে। এইবার সে দেখিয়ে দেবে যে, খেরেস্তান হ'লেও সে মানুষ। তাকে ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে যে সেই দিব্যির অপমান করে, তাকে সেও-অপমান করতে জানে!

সে ইচ্ছা ক'রেই রোতো কামারের দোকানের সামনে দিয়ে একটু বেশি ক'রে যাওয়া আসা করতে লাগল। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে রোতো কিন্তু অতিমাত্রায় কাজের লোক হয়ে উঠেছে। এখন দিনরাত দোকানে বসে লোহা পেটে আর হাফর ঠেলে। খুশিকে দেখলে সে

যন এতটুকু হয়ে যায়—লজ্জায় ভয়ে! কিসের এত লজ্জা, এত ভয়, ইটুকু মেয়েকে সে খুব ভাল ক'রে যে বোঝে, তা নয়। কী যেন মস্ত ড় অপরাধের বোঝা জোর ক'রে তার মাথাটা ধ'রে নীচু ক'রে দেয়। হুর্শি তার পাশ দিয়ে হাঁটে, আর অমনি সে প্রাণপণ জোরে হাফর ঠলতে থাকে। যেন সমস্ত বিশ্বটাকে সে-ই চালাচ্ছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে জ্বলন্ত লোহাটাকে নেহাই-এর ওপর রেখে পিটতে থাকে। আগুনের ফুলকিতে তার মুখ আর দেখা যায় না।

সেদিন হঠাৎ কুর্শি তার একেবারে চোখের সামনে এসে পড়ল। সে কিন্তু হেসে উঠল, "আ মর্ ড্যাক্‌রা! যেন চেনেনই না আমায়! তোর হ'ল কি বল্ ত!"

রোতো ঘেমে উ'ঠে ভীত চোখের দৃষ্টি দিয়ে চারিদিকে চায়, তারপর আস্তে আস্তে বলে, "না ভাই, আর কাজ নেই! সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার বুক আজো দুরুদুরু ক'রে ওঠে!...শালা ডাকাত!...সে আবার আসছে কখন?..."

কুর্শি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, "আর সে আসছে না। এলে টের পাইয়ে দেবো মজাটা এইবার!"

রোতো কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। আমতা আমতা ক'রে বলে, "আমি ইচ্ছে করলে শালাকে সেদিন গুঁড়িয়ে দিতে পারতুম, শুধু তোর জন্যেই দিইনি।"

কুর্শি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, "মাইরি বলছিস, তুই তাকে মারতে পারবি এবার এলে? ঐ কচার বেড়ার ধারে—যেখেনে সে আমায় কল্কি ছুঁড়ে মেরেছিল, ঐখেনে ওকে মেরে শুইয়ে দিতে

পারবি ?” উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে।

তার আন্দোলিত বুকের পানে তাকিয়ে রোত্তোর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সে হঠাৎ কুর্শির হাত চেপে ধরে এসে। বলে, “এই তোকে ছুঁয়ে ব’লে রাখলাম কুর্শি, ওকে যদি ঐখেনে মেরে শুইয়ে না দিই, তবে আমি বাপের বেটা নই! একবার এলে হ’ল শালা!”

কুর্শি ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, “মর্ হতচ্ছাড়া! বড় যে আস্পর্দ্ধা তোর দেখছি! আমার হাত ধরেন এসে! একবার মেরেই দেখিস, পিঠের ওপর খ্যাংড়ার বাড়ি কেমন মিষ্টি লাগে!” সে আর বলতে পারে না; কান্নায় তার বুক যেন ভেঙে যায়! তারপর, দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যা নেমে আসে—তাদের গির্জ্জার কালো পোশাক-পরা মিসবাবাদের মত!

(১২)

একদিকে মৃত্যু, একদিকে ক্ষুধা।

সেজ-বৌ আর তার ছেলেকে বাঁচাতে পারা গেল না। ওর শুশ্রূষা যেটুকু করেছিল সে শুধু ঐ মেজ-বৌ, আর ওষুধ দিয়েছিল মেম সায়েব—রোমান ক্যাথলিক মিশনারীর।

মেজ-বৌ সেজোর রোগ-শিয়রে সারারাত জেগে বসে থাকে। কেরোসিনের ডিবে ধোঁয়া উদ্গীরণ করে করে ক্লান্ত হয়ে নিবে যায়। অন্ধকারে বন্ধুর মত জাগে একা মেজ-বৌ। আর পাথরের মত স্থির হ'য়ে দেখে, কেমন করে একজন মানুষ আর একজন অসহায় মানুষের চোখের সামনে ফুরিয়ে আসে।

সেজ-বৌ তার ললাটে মেজ-বৌর তপ্ত হাতের স্পর্শ ছোঁয়ায় চকিত হয়ে চোখ খোলে। বলে, "এসেছ তুমি?" তারপর শিয়রে মেজ-বৌকে দেখে ক্ষীণ হাসি হেসে বলে, "মেজ-বু, তুমি বুঝি? তোমার সব ঘুম বুঝি আমার চোখে ঢেলে দিয়েছ?

মেজ-বৌ নত হয়ে সেজোর চোখে চুমু খায়। সেজো মেজো-বৌর হাতটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলে, "মেজ-বু, তুমি কাঁদছ?—" "তারপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "কাঁদ মেজ-বু, মরার সময়েও তবু একটু দেখে যাই, এই পোড়ারমুখীর জন্যেও কেউ কাঁদছে। দেখ মেজ-বু,

তুমি আমার জন্তে কাঁদছ, আর তাই দেখে আমার এত ভালো লাগছে —সে আর কী বলব। ইচ্ছে করছে বাড়ীর সব্বাই যদি আমার কাছে বসে এমনি করে কাঁদে, আমি তা হ'লে হেসে মরতে পারি। হয়ত বা বেঁচেও যেতে পারি। কিন্তু মেজ-বু, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এই ছেলের ভাবনা? ওর মায়া কাটিয়েছি। কাল ওর বাবাকে দেখেছিলুম 'খোয়াবে', বললে, খোকাকে নিতে এসেছি। আমি বললুম, আর আমায়? সে হেসে বললে, তোকে নয়। আমি কেঁদে বললুম, যম ত নেবে, তুমি না নাও!"

মেজ-বৌ কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে, "চুপ ক'রে ঘুমো সেজো, তোর পায়ে পড়ি বোনটি!"

সেজো মেজো-বৌর হাতটা গালের নীচে রেখে পাশ ফিরে শোয়। বলে, "কাল ত আর আসব না মেজ-বু কথা বলতে। ঘুমোব বলেই ত কথা কয়ে নিচ্ছি। এমন ঘুমুব যে, হু—ই 'গোদা ডাঙ্গায়' গিয়ে রেখে আসবে তিনগাড়ি মাটি চাপা দিয়ে। যেন ভূত হয়েও আর ফিরে আসতে না পারি!...দেখ মেজ-বু, কাল সে যদি শুধু খোকাকে নিতে আসত, তাহ'লে কি হাসতে পারত অমন করে? আমায়ও নিয়ে যাবে, ও চিরকাল আমার সঙ্গে অমনি দুষ্টুমি করে কথা কয়েছে!...তোমার মনে আছে মেজ-বু, মরার আধঘণ্টা আগেও আমায় কেমন করে বললে? আমি বললাম, "খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার!" সে বললে, "আমার সামনে তুই যদি এখ্‌খুনি মরিস, তা হলে আমার মরতে এত কষ্ট হয় না!..."

শিয়রে প্রদীপ নিবু-নিবু হয়ে আসে। শুধু মেজ-বৌর চোখ ভরা

আকাশের তারার মত চোখের জলে চিকমিক করে। বলে, "সেজো, তোর কিছু ইচ্ছে করছে এখন?"

সেজো ধীর শান্ত স্বরে বলে, "কিছু না। আর এখন কোনো কিছু পেতে ইচ্ছে করে না মেজ-বু! কাল পর্য্যন্ত আমার মনে হয়েছে, যদি একটু ভালো খাবার পথ্যি পেতুম—তাহ'লে হয়ত বেঁচে যেতুম। খোকার মুখে তার মায়ের দু-ফোঁটা দুধ পড়ত। আর ত পাবে না বাছা আমার!" বলেই ছেলের গালে চুমু খায়।

একটা আঁধার রাত যেমন ডাইনীর মত শিস দিয়ে ফেরে। গাছপালা ঘরবাড়ী—সব যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমতে থাকে! তারাগুলোকে দেখে মনে হয়, সহস্র হতভাগিনীর শিয়রে নিবু-নিবু পিদিম।

এরি মাঝে মাটীর ঘরের মাটীর শেযে শুয়ে একটী মানুষ নিবতে থাকে রিক্ত-তৈল মৃৎ-প্রদীপের মত। তেল ওর ফুরিয়ে গেছে, এখন সলতেতে আগুন ধরেছে। ওটুকুও ছাই হ'তে আর দেরি নেই।

সেজো মেজ-বৌর হাতটা বাঁ বুকে জোরে চেপে বলে, "দেখছ মেজ-বু, বুকটা কি রকম ধড়ফড় করছে। একটা পাখীকে ধরে খাঁচায় পুরলে সে যেমন ছটফট করে বেরোবার জন্যে, তেমনি, না? উঃ! আমার যেন দম আটকে আসছে। মেজ-বু! বাইরে কি এতটুকু বাতাস নেই?"

মেজ-বৌ জোরে জোরে পাখা করে।

সেজো মেজ-বৌর পাখা-সমেত হাতটা চেপে ধরে বলে, "থাক, থাক! ও বাতাসে কি আর কুলোয় মেজ-বু? সব সইত আমার, সে যদি পাশে বসে থাকত! আমি চলে যাচ্ছি দেখে সে খুব করে কাঁদত

তার চোখের পানিতে আমার মুখ যেত ভেসে!" আর বলতে পারে না। কথা আটকে যায়। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়।

খোকা কেঁদে ওঠে। মেজ-বৌ কোলে নিয়ে দোলা দেয়, ছড়া গায় —"ঘুম আয়োরে নাইলো-তলা দিয়া, ছাগল-চোরায় যুক্তি করে খোকনের ঘুম নিয়া।"

ভোরের দিকে সেজ-বৌ ঢুলে পড়তে লাগল মরণের কোলে। মেজ-বৌ কাউকে জাগালে না। সেজোর কানে মুখ রেখে কেঁদে বললে, "সেজো। বোনটি আমার! তুই একলাই যা চুপটি করে। তোর যাবার সময় আর মিথ্যে কান্নার তুফু নিয়ে যাসনে!"

সেজো শুনতে পেলে কি না, সে-ই জানে। সে শুধু অস্ফুটস্বরে বললে, "খোকা ···তুমি····"

মেজ-বৌ সেজোর দুই ভুরুর মাঝখানটীতে চুমু খেয়ে বললে, "ওকে আমি নিলাম সেজো, তুই যা তোর বরের কাছে। আর পারিস ত আমায় ডেকে নিস।"

মেজ-বৌ আর থাকতে পারল না—ডুকরে কেঁদে উঠল।

দূরে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভোরের নামাজের আহ্বান শোনা যাচ্ছিল— আস্‌সালাতু খায়রুম্ মিনান্নোম।—"ওগো, জাগো! নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ঢের ভাল। জাগো!"

মেজ-বৌ দাঁতে দাঁত ঘসে বললে, "অনেক ডেকেছি আল্লা, আজ আর তোমায় ডাকব না।"

সেজোর মুখ কিন্তু কী এক অভিনব আলোকচ্ছ্বাসে আলোকিত হ'য়ে উঠল। সে প্রাণপণ বলে দুই হাত তুলে মাথায় ঠেকালে—

মুনাজাত করার মত ক'রে ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে গেল—কিন্তু তা তখ্‌খুনি ছিন্ন লতার মত এলিয়ে পড়ল তার বুকে।

মেজ-বৌ মুগ্ধের মত তার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের শেষ জ্যোতি দেখলে —তারপর আস্তে আস্তে তার চোখের পাতা বন্ধ করে দিলে।

প্রভাতের ফুল দুপুরের আগেই ঝ'রে পড়ল।

মেজ-বৌ আর চুপ করে থাকতে পারল না! চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, "মাগো, তোমরা ওঠ, সেজো নেই···"

প্রভাতের আকাশ-বাতাস হাহাকার ক'রে উঠল—নেই—নেই —নেই!

(১৩)

সেজ-বৌর খোকাকেও আর বাঁচানো গেল না।

মাতৃহারা নীড়-ত্যক্ত বিহগ-শিশু যেমন ক'রে বিশুষ্ক চঞ্চু হাঁ করে ধুঁকতে থাকে, তেমনি ক'রে ধুঁকে—মাতৃস্তন্যে চিরবঞ্চিত শিশু!

মেজ-বৌর দু চোখে শ্রাবণ রাতের মেঘের মত বর্ষাধারা নামে বলে, "সেজো-বৌ, তুই যেখানেই থাক্, নিয়ে যা তোর খোকাকে! আর এ যন্ত্রণা দেখতে পারিনে!"

খোকা অস্ফুট দীর্ণ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে, "মা!"

মেজ-বৌ চুমোয় চুমোয় খোকার মুখ অভিষিক্ত ক'রে দিয়ে বলে, "এই যে যাদু, এই যে সোনা, এই যে আমি!"

বাড়ীর মেয়েরা ভিড় ক'রে এসে কাঁদে। শাবককে সাপে ধরলে বিহগ-মাতা ও তার স্বজাতীয় পাখীর দল যেমন অসহায়ের মত চীৎকার করে, তেমনি।

সাপের মুখের মুমূর্ষু বিহগ-শিশুর মতই মেজ-বৌর কোলে মৃত্যু-মুখী খোকা কাৎরায়।

ভোর না হতেই সেজ-বৌর খোকা সেজ-বৌর কাছে চলে গেল। শবেরাত রজনীতে গোরস্থানের মৃৎ-প্রদীপ যেমন ক্ষণেকের তরে ক্ষীণ আলো দিয়ে নিবে যায়, তেমনি।

দুপুর পর্য্যন্ত একজন-না-একজন কেঁদে বাড়ীটাকে উত্যক্ত ক'রে তোলে, তারপর গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে। শোকের বাড়ীর ক্লান্ত প্রশান্তি, অতল গভীর।

ঘুমায় না শুধু মেজ-বৌ। তার ছেলেমেয়ে দুটীকে বুকে চেপে দূর আকাশে চেয়ে থাকে। গ্রীষ্মের তামাটে আকাশ, যেন কোন্ সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রতপ্ত আঁখি!...বাঁশ গাছগুলো যেন তন্দ্রাবেশে ঢু'লে ঢু'লে পড়ছে। ডোবার ধারে গাছের ছায়ায় পাতি-হাঁসগুলো ডানায় মুখ গুঁজে একপায়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে! একপাল মুরগি আতা কাঁঠালের ঝোপে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

অদূরে বাবুদের শখের বাড়ীর বিলিতি তালগাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে। তারই সামনে দীর্ঘ দেবদারু গাছ—যেন ইমামের পেছনে অনেকগুলো লোক সারি সারি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে—সামনের শুকনো বাগানটায় জানাজার নামাজ।

এমনি সময় উত্তরের আম বাগানের ছায়া-শীতল পথ দিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীর মিস জোন্স প্যাঁকালেদের ঘরে এসে হাজির হ'ল। মিস জোন্স ওদের বিলিতি দেশে যুবতী, আমাদের দেশে 'আধ-বয়েসী'। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি বয়েস। শ্বেতবসনা সুন্দরী। এই মেয়েটীই সেজ-বৌ আর তার খোকাকে ওষুধ পথ্য দিয়ে যেত।

সেজ-বৌ আর তার ছেলেকে যে বাঁচানো যাবে না, তা সে আগেই জানত এবং তা মেজ-বৌকে আড়ালে ডেকে বলেও ছিল। তবু তার যতটুকু সাধ্য, তাদের বাঁচাবার চেষ্টাও করেছিল।

সকালে এসে মেজ-বৌকে একবার সে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। এই

সময়টা বেশ নিরিবিলি ব'লেই হোক, বা মেজ-বৌর স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তিগুণেই হোক, সে আবার এসে মেজ-বৌর সঙ্গে গল্প শুরু ক'রে দিলে।

এ কয়দিনে মেজ-বৌও আর তাকে 'মেম সায়েব' ব'লে অতিরিক্ত স-সঙ্কোচ শ্রদ্ধার ভাব দেখায় না। তাদের সম্বন্ধ বন্ধুত্বে পরিণত না হ'লেও অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

মিস জোন্স বাঙালা ভাল বলতে পারলেও সায়েবী টানটা এখনও ভুলতে পারেনি। তবে তার কথা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয় না কারুর।

এ-কথা সে-কথার পর মিস জোন্স হঠাৎ বলে উঠল, "ডেখো, টোমার মটো বুড্‌ঢি-মটি মেয়ে লেখাপরা শিখলে অনেক কাজ করটে পারে। টোমাকে ডেখে এত লোভ হয় লেখাপড়া শেখাবার।"

মেজ-বৌ হঠাৎ মেমের মুখের থেকে যেন কথা কেড়ে নিয়েই বলে উঠল, "সত্যি মিসি-বাবা! আমারো এত সাধ যায় লেখাপড়া শিখতে! শেখাবে আমায়? আমার আর কিছু ভাল লাগে না ছাই এ বাড়ী ঘর!"

মিস জোন্স খুশিতে মেজ-বৌর হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "আজই রাজী। বরো ডুখ্‌খু পাচ্ছো টুমি, মনও খুব খারাপ আছে টোমার এখন; এখন লেখাপড়া শিখলে তোমার মন এসব ভুলে ঠাকবে।"

মেজ-বৌ কী যেন ভাবলে খানিক। তারপর ম্লান হেসে ব'লে উঠল, "আমার ছেলে-মেয়েদের কী করব?"

মিস জোন্স হেসে বললে, "আরে, ওডের ও সঙ্গে নিয়ে যাবে যাবার সময়। ওখানে ওরাও লেখাপড়া করবে। ওডের আমি বিস্কুট ডেবে, খাবার ডেবে, ওরা খুশি হয়ে ঠাকবে।"

মেজ-বৌ আবার কী ভাবতে লাগল যেন! ভাবতে ভাবতে তার বেদনা-ম্লান চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এই বাড়ীতে যেন তার নাড়ী পোঁতা আছে। দুটো ছেলে-মেয়ের বন্ধন, তারাও সাথে যাবে, আর সে চিরকালের জন্যও যাচ্ছে না—তবু কি এক অহেতুক আশঙ্কায় বেদনায় যেন তার প্রাণ টনটন করতে লাগল।

মিস জোন্স সুচতুরা ইংরেজ মেয়ে। সে ব'লে উঠল, "আমি টোমার মনের কঠা বুজেছে। তোমাকে একেবারে যেটে হবে না সেখানে। ক্রীশ্চানও হ'টে হবে না। টুমি শুধু রোজ সকালে একবার ক'রে যাবে। আবার ডুপুরে চ'লে আসবে।"

মেজ-বৌ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, তা আমি যেতে পারব মিস-বাবা! পাড়ায় দুদিন একটা গোলমাল হবে হয়ত। তবে তা সয়েও যেতে পারে দু-এক দিনে।"

মেজ-বৌর ছেলে-মেয়ে দুটী বিস্কুটের লোভে উস্‌খুস করছিল এবং মনে মনে রাগছিলও এই ভেবে যে, কেন তাদের মা তখনি যাচ্ছে না মিস-বাবার সাথে। কিন্তু মায়ের শিক্ষাগুণে তারা মুখ ফু'টে একটি কথাও বললে না। খোকাটি শুধু একবার তার ডাগর চোখ মেলে করুণ নয়নে মিস-বাবার দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলে লজ্জায়।

মিস জোন্স খোকাকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে তার হাতব্যাগ থেকে চারটে পয়সা বের ক'রে তাদের ভাইবোনের হাতে দুটো ক'রে দিয়ে বললে, "যাও, বিস্কুট কিনে খাবে!"

মেয়েটি পয়সা হাতে ক'রে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে যেন অনুমতি চাইলে। মেজ-বৌ হেসে বললে, "যা, বিস্কুট কিনে খা গিয়ে।"

মিস জোন্স উঠে প'ড়ে বললে, "আজ টবে আসি। কা'ল ঠেকে টুমি সকালেই যাবে কিণ্টু!"

মেজ-বৌ অন্যমনস্কভাবে শুধু ঘাড় নেড়ে জানাল।

সমস্ত আকাশ তখন তার চোখে ঝাপসা ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে।

পাশের আমগাছে দুটো কোকিলে যেন আড়ি ক'রে ডাকতে শুরু করেছে—কু কু কু। সে ডাকে সারা পল্লী বিরহ-বিধুরা বধূর মত আলসে এলিয়ে পড়েছে।

মেজ বৌ মাটিতে এলিয়ে পড়ল, নিরাশ্রয় নিরাবলম্বন ছিন্ন স্বর্ণহার যেমন ক'রে ধুলায় প'ড়ে যায়, তেমনি ক'রে।

(১৪)

পরদিন সকালে কেউ উঠবার আগেই মেজ-বৌ তার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে মিস জোন্সের কাছে চলে গেল। যাবার আগে শুধু বড়-বৌকে চুপি চুপি বলে গেল, "শাশুড়ী বিশেষ পীড়াপীড়ি করলে বাপের বাড়ী গেছি ব'লো।" বড়-বৌ ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ ক'রে রইল। মেজ-বৌর এতটা বাড়াবাড়ি তার ভাল লাগছিল না। তবু সে মেজ-বৌকে একটু বেশি রকম ভালোবাসে ব'লেই কিছু না ব'লে অভিমানে গুম্ হয়ে রইল। কত বড় দুঃখে পড়ে মেজ-বৌ আজ মিস-বাবাদের কাছে সরে যাচ্ছে, তাও তার অজানা ছিল না। তাই আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েই রইল।

দিনকয়েক আগে থেকে তার শাশুড়ীও কাঠুরে-পাড়ার সবডেপুটি সাহেবের বাড়ীতে চাকরি নিয়ে ছিল, তাই সকালে উঠেই সেও চলে গেল, কারুর খোঁজ-খবর নেবার আর গরজ করলে না। নইলে সকালেই হয়ত একটা কাণ্ড বেধে যেত!

পাড়ার অল্প দূরেই রোম্যান ক্যাথলিক গির্জ্জা ঘর। মেজ-বৌ গির্জ্জার দ্বারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন গির্জ্জার ভিতরে খ্রীষ্টের স্তব-গান গীত হচ্ছিল সমবেত নারী-কণ্ঠে। গানের কথা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছিল না, তার কাছে অপূর্ব্ব মিষ্টি লাগছিল

শুধু তার স্বর আর প্রকাণ্ড হলে প্রতিধ্বনিত অর্গ্যানের গম্ভীর মধুর আওয়াজ। তার মন শ্রদ্ধায় খুশিতে ভ'রে উঠেছিল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল তারই বাড়ীর পাশের মস্‌জিদের আজান ধ্বনি। তার মন কী এক অব্যক্ত বেদনায় কেবলি আলোড়িত হয়ে উঠতে লাগল। তার মন যেন কেবলি শাসাতে লাগল, সে পাপ করছে—অতি বড় অন্যায় করছে, এর ক্ষমা নাই, এর ফল ভীষণ, তাকে অনন্ত কালের জন্য—

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কার ছোঁয়ায় চমকে উঠে দেখল, মিস জোন্স মধুর হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে পিছনে দাঁড়িয়ে। মেজ-বৌকে ইঙ্গিতে পিছনে আসতে ব'লে মিস জোন্স গির্জ্জার পাশের বাড়ীর একটা কামারায় গিয়ে ঢুকল। মেজ-বৌ কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল দেখে মিস জোন্স ভিতর হ'তে বললে, 'ভিটরে এসো'। মেজ-বৌ স-সঙ্কোচে ভিতরে গিয়ে দেখলে, সামনের টেবিলে চা বিস্কুট প্রভৃতি খাবার। মিস জোন্স মেজ-বৌকে তার বিছানায় জোর করে বসিয়ে বললে, "একটু চা খাও আমার সাটে, টারপর কঠা হবে।"

মেজ-বৌ কিছুতেই রাজী হয় না খেতে। অনেক পীড়াপীড়ির পর বললে, "মিস বাবা, আমাদের জাত যায় তোমাদের সাথে খেলে, মিস জোন্স চেয়ারে ধপাস ক'রে ব'সে প'ড়ে বললে, "ও গড! আমিও টো টা জানটুম।" ব'লে মুখ ম্লান ক'রে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "কিণ্টু টোমাদের মুসলমান ঢর্ম্মের অনেক কিছু আমি জানি, টাটে কারুর সঙ্গে খেটে টো নিষেড নেই।" মেজ-বৌ হেসে বললে, "তা ত আমি জানি না, আমাদের মৌলবী সাহেব আর মোড়ল

ত অনেক জরিমানা করেছে খেরেস্তানদের ছোঁওয়া খাওয়ার জন্যে।”

মেম সায়েব আর কিছু না ব’লে মেজ-বৌর ছেলে-মেয়ে দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে বিস্কুট হাতে নিয়ে বললে, “এডের আমি চা খাওয়ালে ডোষ হবে না টো?” মেজ-বৌ হেসে বললে, “হবে।” মেম সাহেব এইবার একটু জোরের সঙ্গে বললে, “নিশ্চয় হবে না! ওরা এখনো মুসলমান খ্রীশ্চান কিছু নয়—ওরা শিশু।”

মেজ-বৌ চুপ ক’রে রইল। সে তখন অন্য কথা ভাবছিল।

ক্ষুধার্ত্ত শিশু বিস্কুট হাতে ক’রে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মেজ-বৌ অস্ফুটস্বরে বললে, “খা!”

ছেলে-মেয়েদের চা খাওয়া হ’লে মিস জোন্স নিজে চা খেয়ে বললে, “টোমায় জোর ক’রে খাওয়াব না। টবে টুমি কিছু না খেয়ে অমনি রইলে। যাক্, টোমাকে ডাকব কী ব’লে? টোমার নাম টো একটা আছে!”

মেজ-বৌ হেসে বললে, “নাম একটা ছিল হয়ত বিয়ের আগে। তা এখন ভুলে গিয়েছি। এখন আমি মেজ-বৌ।”

মিস জোন্স হেসে বললে, “আচ্ছে, আমি টোমায় মেজ-বৌই বলব।”

ব’লেই মিস জোন্স কী ভাবলে অনেকক্ষণ ধ’রে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, “ডেখ মেজ-বৌ, আমি টোমায় ভালোবেসেছি। কেন টোমায় এত ভাল লাগে জানিনা। আমি টোমাকে আপন সিস্টারের মটো করে লেখা পড়া শেখাব।”

মেজ-বৌর চোখ জলে টলমল ক’রে উঠল।

প্রায় এগারটার সময় যখন সে ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে বাড়ী ঢুকল আবার এসে, তখন তার শাশুড়ী শিলাবৃষ্টির মেঘের মত মুখ ক'রে রান্নাঘরের সামনে ব'সে বোধ হয় মেজ-বৌয়েরই প্রতীক্ষা করছিল।

মেজ-বৌ কিছু না ব'লে সোজা ঘরে ঢুকল গিয়ে। শুধু তার খোকা দৌড়ে তার দাদির কোলে উঠে বললে, "বল ত দাদি, কোথায় গিয়েছিলুম?" ভিতর থেকে মেজ-বৌ চীৎকার ক'রে উঠল, "খোকা, এদিকে আয়!" ছেলে ভয়ে ভয়ে মায়ের কাছে চ'লে গেল। শাশুড়ীও এইবার শতধারে ফেটে পড়ল। ঝড় বজ্র ও শিলাবৃষ্টির মতই বেগে চীৎকার, কান্না ও গালি চলতে লাগল। মেজ-বৌ চুপ ক'রে শুনে যেতে লাগল।

চাঁদ-সড়কে সেদিন বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া প'ড়ে গেল। লক্ষ্মী-ছাড়া-মত চেহারার লম্বাচওড়া একজন মুসলমান যুবক কোত্থেকে এসে সোজা নাজির সাহেবের বাসায় উঠল। নাজির সাহেব কৃষ্ণনগরে সবে বদলি হ'য়ে এসে চাঁদসড়কেই বাসা নিয়েছেন।

যুবকের গায়ে খেলাফতী ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে, চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরেরই জামা-কাপড়—কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা ব'লে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপের' মত টুপি, তাতে কিন্তু অর্দ্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস। তরবারি ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল। হাতে দরবেশী ধরণের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্টি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মত কোট প্যাণ্ট। পায়ে নৌকোর মত এক জোড়া' বিরাট বুট, চ'ড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রং যেমন ফরসা, তেমনি নাক-চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন মাপ ক'রে ক'রে তৈরী—গ্রীক-ভাস্করের এ্যাপোলো মূর্ত্তির মত—নিখুঁত সুন্দর।

কিন্তু এমন চেহারাকে লোকটা অবহেলা ক'রে ক'রে পরিত্যক্ত প্রাসাদের মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত কেমন ম্লান করে ফেলেছে। সর্ব্বাঙ্গে

ইচ্ছাকৃত অবহেলার অযত্নের ছাপ। গায়ে মুখে এত ময়লা যে, মনে হয়, এইমাত্র ইঞ্জিন চালিয়ে এল। দাড়ি সে রাখে না, বোধ হয় হপ্তা খানেক ক্ষৌরী না করার দরুন খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়ে মুখটা বৈঁচীকণ্টকাকীর্ণ বাগিচার মত বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কিন্তু এ-সবে ওর নিজের কোনরূপ অসোয়াস্তি হচ্ছে বলে মনে হয় না। সে স্টেশন থেকে পায়দলে হেঁটে এসে পিঠের কিটব্যাগটা সশব্দে মাটিতে ফেলে দিয়ে নাজির সাহেবের বাইরের ঘরের ইজি-চেয়ারটাতে এমন আরামের সঙ্গে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, যেন এ তার নিজেরই বাড়ী, এবং সে এইমাত্র বাথ-রুম থেকে 'ফ্রেশ' হ'য়ে বেরিয়ে আসছে।

তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে এবং নাজির সাহেব তখনও ওঠেননি।

ইজি-চেয়ারে শোওয়ার একটু পরেই যুবকের নাক ডাকতে লাগল।

গোটা আটেকের সময় নাজির সাহেব দহ্‌লিজে এসে যুবককে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। মনে করলেন, কোনো কাবুলীওয়ালা কাপড়ের গাঁটরি রেখে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নাজির সাহেব অতি মাত্রায় ভালমানুষ। কাজেই একজন কাবুলীওয়ালা তাঁর ইজিচেয়ারে ঘুমুচ্ছে মনে করেও তিনি কিছু না ব'লে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন ; এবং যাতে বেচারার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য তাঁর দুরন্ত ছেলেমেয়ে ক'টিকে বাইরের ঘরে যেতে নিষেধ করলেন।

ছেলেরা এ খবর জানত না। তারা মনে করল, মানা যখন করছে, তখন নিশ্চয়ই কোনো একটা মজার জিনিস এসে থাকবে সেখানে। ওদের দলের সর্দার আমীরের বয়স খুব জোর বছর আটেক হ'বে,

বাকি সব তার জুনিয়র। সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত এক এক ধাপ ক'রে নীচে নামতো লাগল।

আমীর তার 'গ্যাং'কে চুপি চুপি কি বললে। সকলের চোখে মুখে খুশির একটা তীব্র হিল্লোল ব'য়ে গেল—হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসানির মত। চুণীবিল্লীর মত মুখ ক'রে সকলে বেরিয়ে গেল! তারপর বাইরের দিক থেকে এসে ঈষৎ দরজা ফাঁক ক'রে দেখতে লাগল। কিন্তু লোকটার চেহারা দেখে অনেকটা উৎসাহ কমে গেল। ওর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদে যেটি, সে প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, "ওঁ বাঁবাঁ! জুঁজুঁ।" তার একধাপ উঁচু সিনিয়র ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে, "উহু, ছেলে-ধরা, ঐ দেখ্ ঝুলি!" বলেই কিটব্যাগটা দেখিয়ে দিলে। বাস্, আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে আমীর ছাড়া আর সকলে "মার মার না পগার পার" ক'রে দৌড় দিলে!

আমীর কিন্তু হটবার ছেলে নয়। তার উপর সে দল-পতি। ভয় যতই করুক, পালিয়ে গেলে তার প্রেস্টিজ থাকে না। কাজেই সে কিছুই না ব'লে গম্ভীরভাবে একটা লম্বা খড় এনে সোজা নিদ্রিত যুবকটির নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিল; যুবকটি একেবারে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। আমীরের স্ফূর্তি দেখে কে! সে তখন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়েছে!

যুবকটি কিছু না বলে হেসে পকেট থেকে একটি রিভলবার বের ক'রে আমীরের দিকে লক্ষ্য ক'রে শট করলে। ভীষণ শব্দে নাজির সাহেব মুক্তকচ্ছ হ'য়ে ছুটে এলেন। আরো অনেকে ছুটে এল। আমীর ভয়ে জড়পিণ্ডবৎ হ'য়ে গেছে, কান্না পর্য্যন্ত যেন আসছে না! তার

বাবাকে আসতে দেখে সে একেবারে চীৎকার ক'রে তাঁকে জড়িয়ে ধরল গিয়ে। তিনি কিছু বলবার আগেই যুবকটি হাসতে হাসতে তার রিভলবারটা নিয়ে আমীরের হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলতে লাগল, "এটা তোমায় দিলাম।" নাজির সাহেবের দিকে ফিরে বললে, "এটা নকল রিভলবার। এটা দিয়ে অনেক পুলিশকে অনেকবার ঠকিয়েছি।"

নাজির সাহেব ও উপস্থিত সকলে যুবককে উন্মাদ মনে ক'রে হতভম্ব হ'য়ে তার কার্য্যকলাপ দেখছিলেন। এইবার অনেকেই হেসে ফেললে। কিন্তু কারুর কিছু বলবার আগেই আমীর তার বাবার কোল থেকে নেমে যুবকটির দিকে রিভলবার লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠল, "এইবার হাম তোমাকে গুলি করেগা।"

নাজির সাহেব যুবকটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন। একে কোথায় দেখেছেন যেন। অথচ ঠিক স্মরণও করতে পারছিলেন না। হঠাৎ পেছন থেকে 'কড়াফোন' হ'ল, অর্থাৎ অন্দর মহলের দিককার দরজাটার কড়ার শব্দ হ'ল। নাজির সাহেব দোরের ফাঁকে মুখ দিয়ে জিজ্ঞেস করবার আগেই ভিতর থেকে মৃদু শব্দ এল, "চিনতে পারছ না? ও যে আমাদের আনসার ভাই।"

নাজির সাহেব দৌড়ে এসে যুবকটিকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "আরে তোবা! তুমি আনসার! আচ্ছা ভেক ধরেছ যা-হোক। এ কি কাবুলিওয়ালা সেজেছ, কেন বল ত! আরে, ভিতরে এস, ভিতরে এস।" বলতে বলতে তাকে টেনে একেবারে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

অন্দরে যেতেই নাজির সাহেবের স্ত্রী এসে তাকে সালাম করল। যুবক হেসে বললে, "কি রে বুঁচি, তোর চোখের ত খুব তারিফ করতে

হয়! আচ্ছা, এই দশ বছর পরে দেখে চিনতে পারলি কী করে?”—এইখানে বলে রাখা ভাল, শ্রীমতি বুঁচি—ওরফে লতিফা বেগম—আনসারের “খালেরা বহিন্” বা মাসতুত বোন। আনসারের চেয়ে বয়সে সে বছর পাঁচেকের ছোট। কুড়ি বছরেই সে বুড়ী না হ'লেও চারটি ছেলের মা হয়েছে।

লতিফা আঁচলে চোখ মুছে বললে, “মেয়েরা দশ হাজার বছর পরে দেখা হ'লেও আপনার জনকে চিনতে পারে ভাই, ওরা ত আর পুরুষ নয়!” বলেই নাজির সাহেবের দিকে বক্রদৃষ্টি দিয়ে তাকালে।

নাজির সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, “দেখ, স্ত্রীর ভাইকে দশজন ভদ্রলোকের সামনে চিনে ফেলে সম্বন্ধটা ফাঁস ক'রে দিলে তুমি হয়ত খুশি হ'তে, কিন্তু আনসার হ'ত না।”

আনসার নাজির সাহেবের কবজিটা ধরে রাম-টেপা দিয়ে বললে, “চোপ, শালা!”

তার টেপার তাড়নে নাজির সাহেব উহু উহু ক'রে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, “দোহাই ভাই! ছেড়ে দে! আমিই তোর শালা!”

আনসার হেসে হাত ছেড়ে দিলে।

নাজির সাহেব কবজিতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, “উঃ! আর একটু হ'লেই হাতটা পাউডার হ'য়ে গেছিল আর কি! তুমি তেমনি গোঁয়ার আছ দেখছি!...

লতিফা হেসে বললে, এখন তোমার এই ঝুলঝোপ্‌পুর পোশাকগুলো খুলে ফেল দেখি! তৌবা, তৌবা! কী চেহারাই করেছ! কাপড় চোপড় আছে সঙ্গে, না এনে দেবো? আগে নেয়ে নেবে, না, চা আনব?

আনসার মেঝেতেই হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে প'ড়ে ব'লে উঠল, "আঃ! কী নাম শুনালি রে বুঁচি! চা! চা! আঃ। আগে চা নিয়ে আয় ত, তারপর সব হবে!" ব'লেই গুন গুন ক'রে গাইতে লাগল—

কাপ-কেট্‌লিবাসিনী সিদ্ধিবিধায়িনী
মানস-তামসমোষিণী হে!
দুগ্ধ ও শর্করা-মিশ্র শ্বেতাম্বরা
চীনা-ট্রেবাহিনী জাড্য হরে।

লতিফা চা আনতে চ'লে গেল। যাবার সময় ব'লে গেল, "পাগল।"

একটি ছোট্ট কথা! ওতেই মনে হ'ল, যেন লতিফা তার প্রাণের সমস্ত সুধা দিয়ে উচ্চারণ করলে ঐ কথাটি। ঘর-ছাড়া ভাইকে বহুকাল পরে কাছে পেয়ে বোনের প্রাণ বুঝি এমনি করেই তোলপাড় ক'রে ওঠে।

চা করতে গিয়ে সেদিন একটু অতিরিক্তই দেরি হ'ল। সেদিন উনুনের সকল ধোঁয়া বুঝি লতিফার চোখে ভিড় ক'রে জমেছিল এসে। সেদিন চায়ের জলের অর্দ্ধেকটা ছিল কেটলির, আর অর্দ্ধেকটা চোখের।

(১৬)

চা খাওয়া হ'লে পর লতিফা বলে "দাদু, তুমি তোমার ঐ কাব্‌লিওয়ালার পোশাক খুলে ফেল দেখি। কি বিশ্রী দেখাচ্ছে? মাগো! ঐ ময়লা গদ্দর প'রে থাক কি ক'রে, তাই ভাবছি!"

আনসার হেসে বললে, "গদ্দর নয় রে বুঁচি, এর নাম খদ্দর। একটু থাম্‌ না তুই, তারপর দেখবি, কি রকম রাজপুত্তুরের মত চেহারা ক'রে ফেলি।" ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো ক'রে হাসতে লাগল।

ঘণ্টা দুই পরে শেভ ক'রে স্নান সেরে পরিষ্কার কাপড় প'রে যখন আনসার বেরুল, তখন তাকে সত্যি সত্যিই রাজপুত্তুরের মত দেখাচ্ছিল।

নাজির সাহেব ও লতিফা তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আনসারকে বারে বারে দেখতে লাগল।

লতিফার ছেলেগুলি ততক্ষণে এসে বেশ ক'রে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে এবং আমীরের রিভলবারের আওয়াজে চাঁদসড়ক প্রকম্পিত হ'য়ে উঠেচে। সে বারে বারে আসে আর তার মাকে বলে, "বুঝলে মা, আমি এইটে নিয়ে যুদ্ধ করতে যাব। মামা আর আমি ইংরেজকে একেবারে এই গুড়ুম!" ব'লেই তার এবং তার মামার শত্রুর উদ্দেশ্যে রিভলবারের আওয়াজ করে।

আনসার বললে, "বুঝিল রে বুঁচি, ঐ রিভলবারটা নিয়ে আজ

যাকরেছি ট্রেনে? এক বেটা টিকটিকি আমার পিছু নিয়েছিল আজ। শুধু আজ নয়, ওরা আছেই আমার পেছনে? রাস্তায় আমার একটি বন্ধু ছিল সাথে। মাথায় একটা হঠাৎ খেয়াল চেপে গেল। আমি বন্ধুটিকে চুপ ক'রে বললাম, চুপি চুপি ঐ টিকটিকি বাবজীকে খবর দিতে, আমার কাছে রিভলবার আছে। সে গিয়ে খবর দিতেই, আর যায় কোথা! দেখি, শ্রীমান রাণাঘাট স্টেশনে এক ডজন কনস্টেবল নিয়ে হাজির। আমি নামতেই আমাকে বললে, "আপনি থানায় আসুন, আপনাকে আমাদের দরকার আছে।" আমি বললাম, "আমায় সেখানে চা খেতে দেবেন ত?" রেলওয়ে পুলিশের দারোগাবাবু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "আজ্ঞে, চা জলখাবার সব প্রস্তুত রেখেই আপনাকে নিতে এসেছি।" আমি হেসে বললাম, "ধন্যবাদ! চলুন।" তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে সার্চ্চ ক'রে যখন পেলে এই খেলনার রিভলবারটা, তখন তাদের মুখের অবস্থা যা হয়েছিল রে বুঁচি, তা ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। গোবর থাকলে ছাঁচ তুলে নিতাম!" বলেই গগনবিদারী হাসি।

লতিফা হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, "আচ্ছা দাদু, তুমি এখনো ছেলেবেলাকার মতই দুষ্টু আছ দেখছি। সে যাক্, তুমি এতদিন ছিলে কোথায় বলত।"

আনসার হেসে বললে, "আরে, এত বড় খবরটাই রাখিসনে তুই? আজ আসছি ময়মনসিং থেকে। সেখানে এসেছিলাম সিলেট থেকে। সিলেট গেছলাম ত্রিপুরা থেকে। কুমিল্লা গেছলাম চাটিগাঁ থেকে।"

নাজির সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, "আরে থাম.থাম। আর

বলতে হ'বে না। বুঝেছি, টোঁ টোঁ কোম্পানীর দলে নাম লিখিয়েছ তুমি। এই ত?"

আনসার বললে—"কতকটা তাই। তবে একেবারে বিনা উদ্দেশ্যে নয়। ঘুরি, সাথে সাথে একটু কাজও করি।" বলেই হঠাৎ ব'লে উঠল, "বুঝলি রে বুঁচি, তোদের এখানে কিন্তু একদিনের বেশি থাকছিনে।"

লতিফা ব্যথিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের এখানটা তোমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠল নাকি দাদু?"

আনসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, "অভিমান করিস্‌নে ভাই, সব কথা শুনলে তোরাই বাড়িতে জায়গা দিতে সাহস করবিনে।"

নাজির সাহেব বললেন, "জানি ভাই, তুমি দেশের কাজ নিয়ে পাগল! তা হ'লেও এত অল্পে আমার চাকরি যাবে না—সে ভয় তোমায় করতে হ'বে না।"

আনসার বললে, "দাঁড়াও না একটু, এখনি থানা থেকে খবর নিতে আসবে। আমার আসবার আগেই এখানে 'সাইফারটেলিগ্রাম' এসে গেছে যে, ১০৯ নম্বর যাত্রা করলে!"

লতিফা ব'লে উঠল—"১০৯ নম্বর কি দাদু?"

আনসার বললে, "ও-সব বুঝবিনে তোরা। আমাদের রাজনৈতিক অপরাধীদের একটা ক'রে নম্বর আছে—সমস্ত সি-আই-ডি পুলিশ অফিসারের কাছে একটা ক'রে লিষ্ট থাকে। পাছে অন্য কেউ জানতে পারে, তাই আমাদের নাম না দিয়ে নম্বরটার উল্লেখ ক'রে চিঠিপত্র লেখে বা তার করে।"—বলেই আনসার হেসে বললে, "আমাদের কি

কম সম্মান রে বুঁচি! সর্ব্বদা সাথে দু'জন সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী। কোথাও গেলে এলে আগেই পুলিশের অফিসার গিয়ে অভিনন্দিত করে স্টেশনে। তারপর দু'বেলা আমদের দিন কেমন ভাবে কাটছে খবর নেওয়া! একেবারে দ্বিতীয় লাট সাহেব আর কি।"

লতিফার কিন্তু কেন চোখ ছল ছল ক'রে উঠল। আনসারের দিকে তার অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে বললে, "তোমায় ছেলেবেলা থেকেই ত জানি দাদু, তুমি চিরটাদিন এমনি পরের দুঃখে পাগল। তবু আজ কেমন ইচ্ছে করছে, আমার যদি শক্তি থাকত, তোমাকে এমন ক'রে মরণের পথে এগুতে দিতাম না। কিছুতেই না। আচ্ছা দাদু, তোমার কিসের দুঃখ বল ত? বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, বাপ-মা, ভাই-বোন— কিছুরই ত অভাব নেই তোমার; কিন্তু তোমায় দেখে কে বলবে, তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ আছে—তোমার ঘরবাড়ী বলতে কিছু আছে!

আনসার বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে বললে, "আমি ত কোনো দিন কারুর কাছে বলিনে ভাই যে, আমার কোনো কিছু নেই—কেউ কোথাও নেই। দুনিয়ার সব মানুষই একই ছাঁচে ঢালা নয় রে বুঁচি। এখানে কেউ ছোটে সুখের সন্ধানে, কেউ ছোটে দুঃখের সন্ধানে। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমার আত্মীয়-পরিজনের কেউ নই। আমার আত্মীয় যারা, তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না! অনাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। তাই ঘু'রে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।"

(১৭)

শেষের দিকটায় আনসার যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগল, "আমি এখানে কেন এসেছি জানিস? জেল থেকে ফিরে এসে অবধি আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে। আমি এখন...—" বলেই কী বলতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠল, "বুঁচি, এখনো চরকা কাটিস?"

লতিফা হেসে বললে, "না দাদু, এখন আমার চারটি ছেলে মিলে আমাকেই চরকা ঘোরা করে। এখন আপনার চরকাতে তেল দিবার ফুরসৎ পাইনে, তা দেশের চরকা ঘুরাব কখন।"

আনসার হেসে বললে, "হুঁ, এখন তা হলে চরকার সুতো ছেড়ে কোলের সুতদের নিয়েই তোর সংসারের তাঁত চালাচ্ছিস। দেখ্, ও ল্যাঠা ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছিস ভাই। আমি এখনি বলছিলাম না যে, আমার মত বদলে গেছে। এখন আমার মত শুনলে তুই হয়ত আকাশ থেকে পড়বি। বাঁক বোঝাই ক'রে ক'রে, চরকা ব'য়ে ব'য়ে যার কাঁধে ঘাঁটা পড়ে গেছে, তোর সেই চরকা-দাদু আনসারের মত কি শুনবি? সে বলে, সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না!"

লতিফা সত্যি সত্যি এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। সে বললে, "বল কি দাদু, ওরে বাবা, চরকা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য তুমি নাকি মাহমুদকে

একদিন কান ধরে সারা ঘর নাক ঘেঁসড়ে নিয়ে গিয়েছিলে! ওমা, কি হবে! শেষে কি না তুমিই চারকায় অবিশ্বাসী হ'লে?"

আনসার এক গাল পান মুখে দিয়ে বললে, "সত্যি তাই। আমি আজ মনে করি যে, আর সবদেশে মাথা কেটে স্বাধীন হতে পারছে না আর এ দেশের কি সুতো কেটে স্বাধীন হবে?"

নাজির সাহেব বললেন, "দোহাই দাদা, ও মাথা কাটার কথাটা যেখানে সেখানে বলে নিজের কাঁচা মাথাটাকে আর বিপদে ফেলো না!"

আনসার হেসে বললে, "তার মানে, কোনো এক শুভ প্রভাতে মাথাটা দেহের সঙ্গে নন-কো-অপারেশন ক'রে বসবে—এই ত? তা ভাই, যে দেশের মাথাগুলো নোয়াতে নোয়াতে একেবারে পায়ের কাছে এসে ঠেকেছে, সে দেশের দু-একটা মাথা যদি খাড়া হয়ে থেকে তার ঔদ্ধত্যের শাস্তি স্বরূপ খাঁড়ার ঘা-ই লাভ করে, তা হ'লে হেঁট মাথাগুলোর অনেক খানি লজ্জা কমে যাবে মনে করি।"

লতিফা বললে, "চুলোয় যাক তোমাদের রাজনীতি। এখন আমি বলি দাদু, তুমি চিরকালটা এমনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েই কাটাবে?"

আনসার হেসে ব'লল, "চুলোয় আমার চরকাকে দিয়েছি—রাজনীতিটা দিতে পারব না বোধ হয়। তুই ভুল বললি বুঁচি, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াইনি। বনের খেয়েই বনের বাঘ তাড়াচ্ছি! ঘরের খাওয়া আমার রুচল না, কি করবি, কপাল!"

লতিফা হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, "যাক, তুমি কারুর কথাই কোনোদিন শোননি, আজও শুনবে না। তাই ভাবছি, কি ক'রে আমাদের মনে ক'রে এখানে এলে!"

আনসার বললে—"আমি চিরকালই ঠিক আছি। একেবারে বিনা কাজে আসিনি আগেই বলেছি। এখানে একটা শ্রমিকসঙ্ঘ গ'ড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায় আমাদের শ্রমিকসঙ্ঘের একটা ক'রে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতলবেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। এখানে হয়ত মাস খানেক বা তারও বেশি থাকতে হবে। এই ত ময়মনসিংহ-এ দু মাস থেকে এলাম।"

লতিফা ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে নেচে উঠে বললে, "সত্যি দাদু। তুমি এখানে অতদিন থাকবে? বাঃ বাঃ! কী মজাটাই না হবে তা হলে। আমি আজই চিঠি দিচ্ছি খালা-আম্মাকে—তাঁরা সব এসে আমাদের এখানে থাকবেন এখন কিছুদিন। দাদু, লক্ষ্মীটি, এক মাস না, দু মাস, কেমন?"

আনসার হেসে ফেলে বললে, "তুইও ত খোকার মা হয়েও আজও খুকীই আছিস দেখছি রে। চিঠি লেখ, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমি আমার কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকব যে, তোদের সঙ্গে হয়ত সারা দিনে একবার দেখা করতেই পারব না! আমি এখানে থাকলেও ত তোদের এখানে থাকতে পারব না। নাজির সাহেবের পেছনে টিকটিকি লেগে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।"

লতিফার হাস্যোজ্জ্বল মুখ এক নিমিষে ম্লান হয়ে গেল,—শিশুর হাতের রংমশাল জলে নিবে যাবার পর তার দীপ্ত মুখ যেমন নিরুজ্জ্বল হ'য়ে উঠে—তেমনি!

(১৮)

এরপর দু-তিন দিন কেটে গেছে। এবং এই দু-তিন দিন আনসার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রী, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে টাউনে একটা রীতিমত হুলুস্থূল বাধিয়ে তুলেছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রুশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক ক্ষেপাতে। সরকারী কর্ত্তাদের মধ্যেও এ নিয়ে কানাঘুষা চলেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এমন কি, কংগ্রেসওয়ালারা পর্য্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখ বাঁকা মন দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। আনসারের ভ্রূক্ষেপও নাই। সে সমান উদ্যমে মোটরের চাকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বসে চা খেতে খেতে আনসার কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। গল্প সেদিন কিছুতেই জমছে না দেখে নাজির সাহেবও কেমন বিমনা হয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার এ কয়দিন ঝড়ের মত এসে নাকে মুখে যা পেয়েছে দু'টো গুঁজে দিয়ে আবার তার কুলি-মজুর মেথর-চাঁড়ালদের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরেছে। লতিফা রাগ করে, অভিমান করে, কেঁদেও কিছু করতে পারেনি। আনসার হেসে শুধু বলেছে, "পাগলি!" সে হাসি এমন করুণ, এমন বেদনামাখা, আর ঐ একটি কথা এমন স্নেহ-সিক্ত সুরে বিজড়িত যে, তারপর লতিফা আর একটি কথাও বলতে

পারেনি। বেদনা সে যতই পাক, তার বুক সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বেও ভরে উঠেছে যে, তার এই ছন্নছাড়া ভাইটি সর্ব্বহারা ভিখারীদের জন্যই আজ পথের ভিখারী। তাকে কাঙাল করেছে এই কাঙালদের বেদনা। গর্ব্বে কান্নায় তার বুকের তলা দোল খেয়ে উঠল।

আজ সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিত ভাবে আনসার এসে চা চেয়ে যখন ইজি চেয়ারটায় ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল, তখন লতিফা খুশি যেমন হ'ল, তেমনি আনসারের এই ক্লান্তস্বরে কেমন একটু অবাকও হয়ে গেল। এমন বিষাদের সুর তার কণ্ঠে সে কোনো দিন শোনেনি।

চা এনে যখন সে পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল, তখন নাজির সায়েব আপনার মনেই রাজ্যের মাথামুণ্ডুহীন কী-সব ব'কে চলেছেন, আর আনসার মাঝে মাঝে আনমনে হুঁ দিয়ে যাচ্ছে।

লতিফা হেসে বললে, "আচ্ছা বেহুঁস লোক যাহোক তুমি। কাকে বলছ আর কে শুনছে তোমার কথা, বল ত! কী ভাবছ দাদু, অমন করে?

নাজির সায়েব বেচারা মাথা চুলকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ব'লে উঠলেন, "অ! উনি আমাদের হবু ভাবী সাহেবার কথা ভাবছেন! আরে, আগে থেকে বলতে হয়! তা হ'লে কি আর এমন সময় এ বদ্‌রসিকতা করি! কিন্তু ভাই, তোমার এই মেথর-মুর্দ্দাফরাশ-ভরা মনে যে কোনো সুন্দর মুখ উঁকি দিতে পারবে—সে ভরসা করতে কেমন যেন ভরসা পাচ্ছিনে।"

আনসারের মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, কি, দিল না। সে একমনে চা খেয়ে যেতে লাগল। চায়ের প্রসাদে ততক্ষণে তার বিষণ্ণতা অনেকটা কেটে গেছে।

লতিফা নাজির সায়েবকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "তুমি থাম ত একটু! সত্যি দাদু, লক্ষ্মীটি, বল না—আজ তুমি এমন চুপচাপ কেন?"

নাজির সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেপথ্যে বলার মত ক'রে ব'লে উঠলেন, "বাঁদরকে কে গুয়াল-চায়া দিলে। ইয়া আল্লাহ্! আল্লাহু আকবর!"

লতিফা ভুরু বাঁকিয়ে খর চোখে তাকিয়ে ব'লে উঠল, "আবার!"

এইবার আনসার হেসে ফেলে বললে, "নাঃ, আর আমায় গম্ভীর হয়ে থাকতে দিলিনে দেখছি বুঁচি!"

মেঘ অনেকটা কেটেছে দেখে লতিফা খুশি হয়ে আবদারের সুরে বলে উঠল, "কি ভাবছিলে এতক্ষণ, বল না, দাদু!

আনসার চায়ের প্রথম কাপটা শেষ ক'রে দ্বিতীয় কাপটায় চুমুক দিয়ে বললে, "যাঃ! ও কিচ্ছু না। এমনি কী যেন একটু ভাবছিলাম। দেখ্ বুঁচি, এ-দেশের কিচ্ছু হবে না।"

লতিফা চালাক মেয়ে। আনসার এড়িয়ে চলতে চাইছে দেখে সে-ও বাঁকা পথ অবলম্বন করলে। আনসারের ও-কথার উত্তর না দিয়ে সে সোজা প্রশ্ন ক'রে বসল, "আচ্ছা দাদু, রুবির খবর জান কিছু?"

আনসার চমকে উঠল। সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। দু-তিন চুমুক চা খেয়ে অন্য দিকে চেয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, "এইবার তার সাথে দেখা হ'য়েছিল রে বুঁচি।"

লতিফা আরো সরে এসে বললে, "কোথায় দাদু? তোমায় দেখে সে নিশ্চয়ই চিনতে পারলে! কী বললে দেখে? তুমি কি ক'রে চিনলে তাকে?

আনসার ম্লান হাসি হেসে বললে, "দেখা হ'ল ময়মনসিংয়ে। চিনতে দেরি না হ'লেও বিশ্বাস করতে দেরি হয়েছিল আমার। বেশ একটু দেরি..."

ব'লেই আনসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দু-চুমুক চা খেয়ে শান্তস্বরে বললে, "আমি ছাত্রদের একটা মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন সে মিটিং-এ। ও-রি মধ্যে দেখি, একটি বিধবা মেয়ে দুহাতে চিক সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ভাল বক্তৃতা দিতে পারি ব'লে শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছিল, কিন্তু সেদিন স্পষ্টই বুঝলাম, আমার বক্তৃতা শুনে কেউ খুশি হয়ে উঠছেন না। আমার ছাত্রবন্ধুরা হতাশ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমার কথা তখন কেবলি জড়িয়ে যাচ্ছে।"

লতিফা রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনছিল বললে ঠিক বলা হয় না—গিলছিল যেন সব কথা। সে কান্না-দীস কণ্ঠে বলে উঠল, "রুবি বিধবা হয়েছে, দাদু ?"

আনসার চায়ের কাপটায় ঝুঁকে প'ড়ে মুখটা আড়াল ক'রে বললে, "হুঁ!"

মনে হ'ল, সে বুঝি আর কিছু বলতে পারবে না। কেউ একটি কথাও বললে না, কেমন একটা বেদনাময় বিষণ্ণতায় সকলের মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল! মেঘলা দিনের সন্ধ্যা যেমন নামে বন্ধুহীনের বিজন ঘরে।

চা তখন ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। তারই সবটা ঢকঢক ক'রে খেয়ে ফেলে আনসার একটু অধিকতর সহজ সুরে বললে, "তারপর দেখা হ'ল —অনেক কথাও হ'ল রুবির সাথে—রুবির বাবা-মা'র সাথে।—রুবির বাবা যে এখন ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে বুঁচি!"

কিন্তু বুঁচি কিছু বলবার আগেই সে ব'লে যেতে লাগল, "রুবির বাবা অবশ্য ভয়ে ভয়েই আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলেন। ওর মা কিন্তু তেমনি আদর-যত্ন করলেন আমায়। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ বারে বারে জলে ভ'রে উঠছিল।

লতিফা অসহিষ্ণু হয়ে ব'লে উঠল, "রুবি কী বললে, বল না দাদু!"

আনসার হেসে ফেলে বললে, "বলছি, থাম্। রুবির বিয়ে হয়েছিল একটি আই-সি-এস পরীক্ষার্থী ছেলের সাথে। ছেলেটি আমারই সহপাঠী ছিল—অবশ্য আমার বন্ধু ছিল না—নাম তার মোয়াজ্জম। বিলেত যাবার আগেই বিয়ের এক মাসের মধ্যে সে মারা যায়। সে আজ এক বছরেরও বেশি হ'ল। বিয়ের আগেই রুবি ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। এইবার প্রাইভেট আই-এ দেবে। মনে হ'ল ওর বাপ মায়ের ইচ্ছা, ওকে এই লেখাপড়ার মধ্যেই ডুবিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। এর জন্য যথেষ্ট খরচও করছেন তাঁরা। রুবিও খুব মন দিয়ে পড়ছে শুনলাম।"

ব'লে খানিক চুপ ক'রে থেকে আনসার বললে, "রুবির অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী জানেন, তবে এই বৈধব্য তাকে বড় বেদনা দিতে পারে নি—এটা বেশ বোঝা গেল। স্বামীকে সে চেনেনি—আমার যেন মনে হ'ল, তাকে সে চিনবার চেষ্টাও করেনি। তার পড়বার ঘরে তার স্বামীর একটা ফটো পর্য্যন্ত নেই। অথবা সে যে বিধবা, একটু চেষ্টা ক'রেই সে এ-কথা যেন জানাতে চায় তার আচার-ব্যবহারে পোশাক-পরিচ্ছদে। তার বাবা-মা কিছুতেই তাকে পাড়ওয়ালা কাপড় বা গয়না পরাতে পারেন নি। পরে সাদা থান, জুতা পরে না, পান খায় না,—যাকে বলে সর্ব্বপ্রকারে নিরাভরণা। কিন্তু এই নিরাভরণা

রুক্ষবেশে তাকে যে কী সুন্দর দেখায় রে বুঁচি, তা যদি একবার দেখতিস। বৈধব্যের এত রূপ আর আমি দেখিনি।"

ব'লেই নিজের এই প্রশংসা উক্তিতে লজ্জিত হ'য়ে সে নিম্নস্বরে বললে, "কিন্তু বুঁচি, ও রূপকে ভক্তি করা যায়, ভালবাসা যায় না!"

নাজির সাহেব ফোঁস ক'রে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর 'ক্লীনশেভ্‌ড্‌' গালের চিবুকের কল্পিত দাড়িতে বাম হাত বুলোতে বুলোতে ব'লে উঠলেন, "সোবহান-আল্লাহ্‌! সোবহান-আল্লাহ!"

লতিফা ও আনসার দুইজনে এক সঙ্গে হেসে উঠল। আনসার নাজির সাহেবের ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে বলে উঠল, আরে বে-অকুফ! এর মধ্যে লভ টভের কিছু গন্ধ নেই!

নাজির সাহেব ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "দেখ ভাই তারকেশ্বরের ষাঁড়! এ ঘাড়ে এমন করে ধাক্কা মেরো না। এই ঘাড়ই হচ্ছে তোমার বোনের সিংহাসন! এ-ঘাড়ই যদি ভাঙে তা হলে উনি চড়বেন কোথায়?"

লতিফা হেসে বললে, "শ্যাওড়াগাছে! বেশ, আমি পেত্নীই হলাম! এখন গোলমাল যদি কর, সত্যিই ভেঙে দেবো! বল ভাই দাদু, তারপর কী হল।"

আনসার বললে, "জানিস, একদিন আমি সোজা রুবিকে বললাম যে, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও সে যে বিধবা, তা বুঝবার কষ্ট হত না কারুর। সে বললে কি জানিস? সে বললে যে, সে তার বাপ-মাকে শাস্তি দেবার জন্যই অমন ক'রে থাকে। তার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও নাকি তার বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা, এবং আবারও বিয়ে

দেবার চেষ্টা করছেন তলে তলে—তার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই। সে একদিন তার মায়ের সামনেই আমায় বললে, "দেখ আনু ভাই, যাকে কোনো দিনই জীবনে স্বীকার করিনি কোনো কিছু দিয়ে, সেই হতভাগ্যেরই মৃত্যুস্মৃতি আমায় ব'য়ে বেড়াতে হবে সারাটা জিন্দেগী ভয়ে—নিজেকে এই অপমান করার দায় থেকে কী ক'রে মুক্তি পাই, বলতে পার?"

আমি শিউরে উঠলাম। বললাম, "তাই যদি সত্যি হয় রুবি, তবে এ-অপমান শুধু তোমাকে নয়—সেই মৃত হতভাগ্যকেও গিয়ে লাগছে। এ নিষ্ঠুরতা ক'রে কারুর কোনো মঙ্গল হবে না রুবি!"

রুবি তিক্তকণ্ঠে ব'লে উঠল, "একে শুধু তুমিই নিষ্ঠুরতা বলতে পারলে! কিছু মনে ক'রো না আনু ভাই—অতি বড় নিষ্ঠুর ছাড়া আর কেউ এত বড় কথা আমায় বলতে পারত না। তুমি শুধু এর নিষ্ঠুর দিকটাই দেখলে? যে নিষ্ঠুর ক'রে তুলছে আমায় তাকে দেখলে না!"

"ব'লেই সে চলে যেতে যেতে ব'লে গেল, "ফুল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কাঁটা ত আছে! ফুল থাকলে বুকে মালা হ'য়ে থাকত, এখন কাঁটা—কেবল পায়ের তলায় বিঁধবে!"

"এর পরেও কত দিন দেখা হয়েছে, কথাও হ'য়েছে—কিন্তু আমি আর সাপের ল্যাজে পা দিতে সাহস করিনি। একেবারে কাল-কেউটে!"

লতিকা একটু উত্তেজিত স্বরেই বলে উঠল, "কিন্তু তুমি চিনবে না লাহু, তুমি সত্যিই লক্ষ্মীছাড়া! ছোবল মারলেও ওর মাথায় মণি আছে। সাপের মাথার মণি সাতরাজার ধন, তা কি যে-সে পায়?"

বলেই সে চোখ মুছল! আনসার কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল।

আজ কেন যেন তার প্রথম মনে হ'ল, সে সত্যিই দুঃখী। মানুষের শুধু পরাধীনতারই দুঃখ নাই, অন্য রকম দুঃখও আছে—যা অতি গভীর, অতলস্পর্শ! নিখিল-মানবের দুঃখ কেবলই মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী ক'রে তোলে, কিন্তু নিজের বেদনা—সে যেন মানুষকে ধেয়ানী স্বপ্ন ক'রে তোলে। বড় মধুর, বড় প্রিয় সে দুঃখ।

সে হঠাৎ ব'লে উঠল, "যে দিন আমি চলে আসি, বুঁচি, সেদিন সে স্টেশনে এসেছিল। ট্রেন যখন ছাড়ে, তখন আমার হাতে একটা জিনিস দিয়ে বললে, "এইটে আমার বিয়ের রাতের—তোমায় মনে করে গেঁথেছিলাম। আজ শুকিয়ে গেছে, তবু তোমায় দিলাম।"—ব'লেই সে টলতে টলতে চ'লে গেল!"

"ট্রেন ছাড়লে দেখলাম, একটি শুকনো মালা!"

নাজির সাহেব ব'লে উঠলেন, "কি করলি ভাই, সে মালাটা?"

আনসার ধরা গলায় ব'লে উঠল, "পদ্মার জলে ফেলে দিয়েছি।"

লতিফা একটি কথাও না ব'লে আস্তে আস্তে উঠে গেল!

(১৯)

চাঁদ সড়কে সেদিন ভীষণ একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল, মেজ-বৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খৃস্টান হয়ে গেছে।

সত্যিসত্যিই সে খৃস্টান হয়ে গেছে। তবে তার একটু ইতিহাসও আছে।

মেজ-বৌ কিছুদিন থেকে খৃস্টান মিসনারীর মিস জোন্সের কাছে গিয়ে একটু সেলাই ও লেখাপড়া শিখছিল। মিসনারীরা ওদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য হয়ত একটু গায়ে পড়েই দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দুদের অসুখ বিসুখে ওষুধপত্তর দিয়ে সাহায্য করে এবং তারা অনেককে তাদের ধর্মে দীক্ষিতও করতে পেরেছে। কিন্তু মেজ-বৌর ব্যাপার একটু অন্য রকম।

মিস্ জোন্সর কি জন্য জানি না, প্রথম দেখাতেই মেজ-বৌকে চোখে ধরে গেছিল। শুধু চোখে নয়, হয়ত মনেও। মেজ-বৌর নামে পাড়ায় একটা বদনামও আছে যে, ওকে একবার দেখলে ভাল না বেসে পারা যায় না।

মেজ-বৌ সুন্দরী। কিন্তু ওই সৌন্দর্য্যটুকুই ওর সব নয়। এক একজন মানুষের চোখে মুখে একটা জিনিস থাকে, যার জন্য তাকে দেখবামাত্রই মনটা খুশি হয়ে ওঠে, 'তুমি' বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে

করে। শ্রী, লাবণ্য, সুষমা—এর কোনো একটা নাম দিয়ে ওর মানে করা যায় না। অমনি মায়ামাখানো চোখ মুখ মেজ-বৌর।...

পাড়ার পুরুষ-মেয়ে সবাই বলতে লাগল, এইবার মাগীরা মেজ-বৌকে 'আড়কাঠি' ক'রে সব বৌ-ঝিকে 'খেরেস্তান' ক'রে তুলবে!

প্যাঁকালের মা'র চীৎকার ও কান্নায় সমস্ত পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে কান্না চীৎকারের দিবারাত্রির মধ্যে বিরাম ছিল না। কখনো তা অচল হয়ে তাদের ঘরের আঙিনা থেকেই দিগদিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হ'তে লাগল, কখনও বা সচল হয়ে চাঁদসড়ক থেকে কুর্শিপাড়া—কুর্শিপাড়া থেকে কাঠুরেপাড়া—কাঠুরেপাড়া থেকে হাটবাজার ঘুরে—গির্জ্জা মস্‌জিদ প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরতে লাগল।

মেম-সাহেবদেরে সে যে ভাষায় আপ্যায়িত করতে লাগল তার তুলনা মেলা ভার।

ভ্যাগ্যিস মেম সাহেবরা আমাদের বাঙলা ভাষার সব মোক্ষম-মোক্ষম গালির মর্ম্ম বোঝে না, বুঝলে তারা মেজ-বৌকে কাঁধে করে তার বাড়ী বয়ে রেখে যেত!

কলকাতায় প্যাঁকালেকে খবর দেওয়া হ'ল। কুর্শি বিশেষ করে তাগিদ ও পরামর্শ দিতে লাগল ওদের বাড়ী এসে, যে, এ-সময় প্যাঁকালে এলে একটা 'ধুমখাত্তর' কাণ্ড বাধিয়ে দেবে! চাই কি—সে যা পুরুষ মর্দ্দ, মেম-সায়েবকেও ঘরে নিয়ে আসতে পারে ইচ্ছে করলে!

পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব সেদিন মগরবের নামাজের পর নিজে যেচে প্যাঁকালেদের বাড়ী মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বে-ইমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন। পুরুষ মেয়েতে

বাড়ী সরগরম হয়ে উঠল। মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হ'ল যে, কালই মওলানা হজরত পীর গজনফর সাহেব কেমন ও মওলানা রুহানী সাহেবকে এই গোমরাহ বেদীনদেরে নসিহত ও দরকার হ'লে 'বহস' করার উদ্দেশে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা আপাতত তার বাড়ীর ছাগল কয়টা বিক্রি ক'রে পনর টাকা জোগাড় ক'রে দেবে। নইলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে!

আনসার সব শুনেছিল তার বোনের কাছে। কাজেই সে বেশ একটু উৎসাহ নিয়েই এ নিয়ে পাড়ায় কি হয় শুনতে এসেছিল মৌলুদের জলসাতে। সব শোনার পর একটি কথাও না ব'লে নাজির সাহেবের বাসায় ফিরে গেল।

বাসায় গিয়েই ইজিচেয়ারটাতে শুয়ে বললে, "ওরে বুঁচি, বড্ডো মাথা ধরেছে, একটু চা দিতে পারবি?"

লতিফা হেসে বললে, "না, পারব না! কী হ'ল দাদু ওদের সভায় বললে না যে!"

আনসার তিক্তস্বরে ব'লে উঠল, "ঘোড়ার ডিম। মেজ-বৌ হল খ্রীস্টান, লাভ হ'ল, পীর আর মওলানা সাহেবদের! আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা—বেচারী প্যাঁকালের মা'র কপাল ত এমনই পুড়েছে, যেটুকু বাকি ছিল—মোল্লাজি তা শেষ করে গেলেন! এর পরে যদি কাল শুনি যে, প্যাঁকালেরা ঘরগুষ্টি মিলে খ্রীস্টান হয়ে গেছে বুঁচি, তা হ'লে অন্তত আমি কিছু বলব না!"—একটু থেমে আনসার বিষাদঘন কণ্ঠে ব'লে উঠল "বুঝলি বুঁচি প্যাঁকালের মা এত কেঁদে বেড়িয়েছে আজ,

কিন্তু আজ মৌলুদ শরীফ হয়ে যাবার পর এবং পাড়ার মোল্লা-মোড়লদের সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে তার কান্না একেবারে থেমে গেছে! আহা বেচারী! ঐ ছাগল ক'টাই ত ওর সম্বল—তাই তাকে কাল বিক্রী করতে হবে। নইলে ওর জাত যাবে পাড়ার লোকের কাছে।

আনসার উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। লতিফার চোখ-মুখের দুষ্টমির দীপ্তি কখন ম্লান হয়ে কান্না-সজল হয়ে উঠেছিল, তা সে নিজেও টের পায়নি। হঠাৎ সে আকুল কণ্ঠে ব'লে উঠল, "দাদু লক্ষীটি, তুমি একবার কাল মেজ-বৌর আর মেম সাহেবের সাথে দেখা করতে পার? তোমার ভরসা পেলে ও খ্রীষ্টান থাকবে না—এ আমি জোর করে বলতে পারি। আমরা অল্পদিন হ'ল কৃষ্ণনগর এসেছি, এর মধ্যেই ওর সাথে যে কয়টা দিন আলাপ হয়েছে, তাতে বুঝেছি—ও আর যাই হোক, খারাপ মেয়ে নয়। ও বড্ডো অভিমানিনী। পাড়ার লোকের যন্ত্রণাতেই সে খৃষ্টান হ'ল। জান দাদু ও মেম সায়েবের কাছে একটু যাওয়া-আসা করত ব'লে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করবে ব'লে কেবলি ভয় দেখাচ্ছিল। শেষে এমন বদনাম দিতে লাগল, যে বদনাম ওর ওপর দেওয়ার মত মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। মানুষ দুঃখ অভাবে পড়লে তার কি এমনি অধঃপতন হয় দাদু সকল দিক দিয়ে?—"

আনসার গভীর দীর্ঘনিঃশাস ফেলে রাত্রির তারা-খচিত আকাশের দিকে চেয়ে রইল! তার কেবলই মনে হতে লাগল—ঐ রাত্রির আকাশের মতই অসীম দুর্জ্ঞেয় রহস্য-ভরা এই পৃথিবীর মানুষ!

লতিফা চা করবার জন্যে উঠে যাচ্ছিল, হঠাৎ আনসার বলে উঠল, "সত্যিই রে বুঁচি, ক্ষুধিত মানুষ—অভাব পীড়িত মানুষের মত সকল-দিক

দিয়ে অধঃপতিত আর কেউ নয়! ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলি পরস্পরের সর্ব্বনাশ করে। দু-মুঠো অন্নের অভাবে ওদের আত্মা আজ সকল রকমে মলিন। তুই বুঝবিনে বুঁচি, ওদের অভাব কত অতল অসীম, ওদের দুঃখ কত অপরিমেয়! আমি দেখেছি, ঐ হতভাগ্যদের দুর্দ্দশার নিত্যকার ঘটনা—তাইত আমার মুখের অন্ন এমন তেঁতো হয়ে উঠেছে। এক মুঠো ডাল মাখা ভাত যখন খাই, তখন গলার ওধার যেন ও আর পেরোতে চায় না, আটকে যায়। মনে হয় আকাশের ঐ তারার মতই ক্ষুধিত চোখ মেলে কোটি কোটি নিরন্ন নরনারী আমার ওই এক গ্রাস ভাতের দিকে চেয়ে আছে! ওদের দুঃখ তুই বুঝবিনে বুঁচি! দু-মুঠো অন্নের জন্য ওরা মেথর হয়ে তোদের ঘরের বাইরের সকল রকম ময়লা নোংরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। ধাঙড় হয়ে —ভোর না হতেই তোদের গায়ের ধূলো দু-হাত দিয়ে পরিষ্কার করে পথে পথে। তাদের কথা বলিসনে বুঁচি—অন্তত ওদের দোষ দিসনে আমার কাছে কখনো! তুই ত মা, তুই কি বিশ্বাস করবি, যে, ক্ষুধার জ্বালায় মা তার ছেলের হাত থেকে কেড়ে খাচ্ছে? নিজের ছেলে-মেয়েকে নরবলির জন্য বিক্রী করছে দুমুঠো অন্নের জন্য? খোদা তাকে সুখে রাখুন, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা যে কী জ্বালা, তা যদি একটা দিনের জন্যও বুঝতিস, তা হলে পৃথিবীর কোন পাপীকেই ঘৃণা করতে পারতিসনে! শুনবি একটা সত্যি ঘটনার কথা?...

লতিফা চোখে হাত দিয়ে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল, "দোহাই দাদু, তোমার দুপায়ে পড়ি, আর বলো না? এতেই আমার দম ফেটে যাচ্ছে।"

সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে টলতে টলতে উঠে গেল।

আনসার হেসে বললে, "তোর সুখের অন্নকে এমন বিষিয়ে তোলা ভাল হয় নি রে বুঁচি! যাক, কাল আমি সত্যিই মাজ-বৌ আর মিস্ জোন্সের সঙ্গে দেখা করব গিয়ে!..."

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে নাজির সাহেব আনসারকে বলে উঠলেন, "কি হে! আজ নাকি শিকারে বেরুচ্ছ? দেখো দাদা, বাঘিনীর কাছে যাচ্ছ মনে রেখো!"

আনসার হেসে বললে, "আমি শিকার করতে যাচ্ছিনে বেকুফ, আমি যাচ্ছি সুন্দরবনের বাঘকে—সুন্দরবনে ফিরিয়ে আনতে, সভ্য শিকারীর ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে।"

নাজির সাহেবও হেসে বললেন, "অন্য শিকারীর হাত থেকে বাঁচিয়ে শেষে নিজেই বাণ হেনে বসো না। দেখো, ও বড় শক্ত বাঘিনী হে, শেষে বাঘিনীই তোমায় শিকার করে না ফেলে।"

আনসার লতিফার দিকে আড় চোখে চেয়ে একটু গলা খাটো ক'রে বললে, "রক্ষে কর ভাই, বাঘের বাচ্চা পুষবার সখ হয়নি এখনো আমার। এ আমার বাঘ শিকার নয়, এ শুধু কষ্ট স্বীকার!"

নাজির সাহেব একটু জোরেই হেসে বললেন, "তোফা! তোফা! ওগো আর এক কাপ চা দাও তোমার রসরাজ ভাইটিকে! কিন্তু দাদা, বাঘিনীর না হয় বাচ্চা আছে, কিন্তু ঐ সিংহী—যে ঘরে নিয়ে গেছে?"

আনসার হেসে উঠে বলে, "ওকে সিংহী বলো না মূর্খ, ও হচ্ছে নীলবর্ণ শৃগালিনী। হ্যাঁ, ওর কাছে আমায় একটু সাবধানেই যেতে

হবে! ওদের নখদন্তকে ভয় করিনে, ভয় করি ওদের ধূর্ত্তামিকে মিশনারীর মেম!"

নাজির সাহেব ফোঁস ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বাপরে!" মিশনারী! একে মিস, তাহে নারী! উঃ। একটা মিস্‌ফর্চুন না হয়ে যায় আজ! আই মীন ফরচুন ফর মিস!"

লতিফা ধমক দিয়ে বললে, "দোহাই! তোমার আর রসিকতা করতে হবে না! বুড়োকালে ওঁর রস উথলে উঠল! তোমার আজ হ'ল কি বল ত!"

আনসার হেসে বললে, "বুঝলিনে বুঁচি, ওঁর হিংসে হচ্ছে। একটু-খানি মেম সায়েবের সঙ্গে আলাপ করব গিয়ে, এ আর ওঁর সহ্য হচ্ছে না! তুই থাকতে ত ওঁর আর ওদিক পানে যাবার ভরসা নেই!"

লতিফা উঠে যেতে যেতে বললে, "আমি নিজেই দিগদড়ি দিয়ে ছেড়ে দিতে রাজী আছি দাদা-ভাই, কিন্তু ভয় নেই ওঁকে কেউ ছোঁবে না!"

নাজির সাহেবও উঠে যেতে যেতে বললেন, "পেত্নীতে পেলে আর কেউ ছুঁতে সাহস করে!"

আনসার উঠে প'ড়ে বলল, "তোমরা এখন কলহ কর, আমি চললাম।..."

* * *

গির্জ্জায় গিয়ে আনসার শুনল, মিসবাবাদের সঙ্গে দেখা করবার নিয়ম নেই। কিন্তু সে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। পাদরী সাহেবের সঙ্গে ঘণ্টাখানিক তর্কের পর সে এই সর্ত্তে রাজী হ'ল যে, হেলেন ওরফে

মেজ-বৌকে আনসার শুধু জিজ্ঞেস করবে সে স্বেচ্ছায় ক্রীশ্চান হয়েছে কি-না। তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে যে মিশনারীরা ক্রীশ্চান করে নাই, এ-সম্বন্ধেও আনসার যথেচ্ছা প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য আনসারের খদ্দরের বহর ও তার 'এজিটেটর' নামের জন্যই সে এই সুযোগটুকু পেল। আনসারও সাহেবকে স্পষ্টই বললে, "দেখ পাদরী সাহেব! আমি গেঁয়ো মোল্লা-মৌলবী নই, যে ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবে! মেজ-বৌ যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্ম্ম নিয়ে থাকে, আমি কিচ্ছু বলব না। আর যদি অন্য কোন উপায়ে ওর সর্ব্বনাশ করে থাক, তা হ'লে এই নিয়ে দেশময় একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দেব!"

সাহেব একটু ঘেবড়ে গিয়ে বললে, "নো মিস্টার! আপনে যঠেচ্ছা প্রশ্ন করেন আমাদের ভোগ্নি হেলেনকে, আঠাট ভূটপূর্ব্ব মেজ-বৌকে। ডেখিবেন, টাহাকে স্বয়ং ঈশ্বর সট্‌পঠে ডাকিয়াছেন! আমরা কেহ নয়!"

আনসার মনে মনে সায়েবের সঠপথের নিকুচি ক'রে বললে, "সাহেব, এখন একটু ডাকতে পার শ্রীমতী হেলেনকে?"

সাহেব নিজে উঠে গিয়ে একটু পরেই মিস্ জোন্স ও মেজবৌকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

আনসার চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, "গুডমর্নিং মিস্ জোন্স। গুডমর্নিং মিস্—আই মীন মিসেস্ হেলেন!

মিস্ জোন্স স্মিতহাস্যে আনসারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল, কিন্তু মেজ-বৌ বেচারী লজ্জায় এতটুকু হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল। মিস্ জোন্সের সরোষ ইঙ্গিতেও সে কোনো রকমেই একটা নমস্কারও করতে পারল না।

মেজ-বৌ আনসারকে চিনত; এবং একটু ভাল করেই চিনত। কত দিন দূর হ'তে তার দৃপ্ত চরণে তারই বাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করবার সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছে। এমনি কেন যেন ওর ভালো লেগেছিল এই অদ্ভুত লোকটিকে। কতদিন সে বিনা কাজে লতিফার কাছে গিয়ে ব'সে থাকত এই লোকটিকে দেখবার জন্য। ওর জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প সব শুনবার জন্য। ও যেন আলেফ-লায়লার কাহিনীর বাদশাজাদা, ও যেন পুঁথির হরমুজ, মনু-চেহের! আজ তাকেই সামনে দেখে মন্ত্রাহত সাপিনীর মত সে কেবলি মুখ লুকাবার চেষ্টা করতে লাগল।

আনসার মেজ-বৌকে আবছা এক আধটু দেখে থাকবে হয় ত। আর দেখে থাকলেও তার মনে নেই। তার কর্ম্মময় জীবনে নারীমুখ চিন্তা ত দূরের কথা, দেখবারও ফুরসৎ নেই। সে জানে শুধু কার্ল মার্কস, লেনিন, ট্রটসকি, স্টালিন, কৃষক, শ্রমিক, পরাধীনতা, অর্থনীতি। পীড়িত মানবাত্মার জন্য বেদনাবোধ ছাড়াও যে অন্যরকম মর-বেদনা-বোধ থাকতে পারে—এ প্রশ্ন তার মনে জেগেছে এই সেদিন। নারীকে সে অশ্রদ্ধাও করে না, নারীর প্রতি তার কোনো আকর্ষণও নেই। নারী সম্বন্ধে সে উদাসীন মাত্র।

আজ সে মুক্তাবগুণ্ঠিতা মেজ-বৌকে প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখল। তাকে দেখবামাত্র তার হঠাৎ কেন মনে হ'ল, এর যেন কোথায় রুবির সঙ্গে মিল আছে। রুবির কথা মনে হতেই বুকের কোন এক কোমল পর্দ্দায় যেন চিড় খেয়ে উঠল। আনসার কেমন যেন অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগল।

মিস জোন্স ইংরিজিতে বললে, "মনে হচ্ছে আপনি একে চেনেন না। চিনলে অন্যের কথা শুনে এর কাছে আসতেন না।"

আনসারও ইংরিজিতেই বললে, "ওকে জানি, তবে চিনিনে সত্য। ভয় নেই, আমি ওকে ফিরিয়ে নিতে আসিনি, শুধু জানতে এসেছি, ও স্বেচ্ছায় ক্রীশ্চান হয়েছে কি না। আশা করি, এ প্রশ্ন করলে আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না।"

মিস জোন্স তারাগ্রামের 'জি' সুরের মত মিহিন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, "কথনই নহে। আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিটে পারেন!"

ধন্যবাদ দিয়ে আনসার প্রায়-প্রকম্পিতা মেজ-বৌর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা বলুন ত, আপনার হঠাৎ খৃস্টান হবার কারণ কি ?"

মেজ-বৌ তার আনত নয়ন আনসারের মুখে তুলে ধরেই আবার নামিয়ে ফেলে বললে, আমি ত হঠাৎ খৃস্টান হইনি !"

আনসার হেসে ফেলে বললে, "তার মানে, আপনি একটু একটু করে খৃস্টান হয়েছেন, এই বলতে চান বুঝি ?"

মেজ-বৌ তার সেই জাদুভরা হাসি হেসে বললে, "জি, না। আপনারা একটু একটু করে আমায় খৃস্টান করেছেন !"

আনসার তার বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে এই রহস্যময়ী নারীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখল। তার পরে সহানুভূতি-মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, "বুঝেছি, আমাদের ধর্মান্ধ সমাজ কত বেশি অত্যাচার ক'রে আপনার মত মেয়েকেও খৃস্টান হ'তে বাধ্য করেছে !"

দুঃখিনী মেজ-বৌর দুই চক্ষু এই দুটি দরদভরা কথাতেই অশ্রুতে

৮

পুরে উঠল। একটু পরেই টসটস করে তার গাল বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মিস জোন্স এবং পাদরী সাহেবের নিমেষে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তা আনসারের নজর এড়াল না।

মিস জোন্স কিছু বলবার আগেই আনসার বলে উঠল, "ভয় করবেন না, আমি আমার হৃদয়হীন সমাজে এই ফুলের প্রাণকে নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে মারতে চাইনে। আমার শুধু একটি অনুরোধ, একে আপনারা মানুষ করে তুলবেন, তা হলে বহু মানুষের বহু কল্যাণ সাধিত হবে এর দ্বারা।"

মিস্ জোন্স ও পাদরী সাহেব দু-জনেই অতিমাত্রায় খুসি হয়ে বললে, "ডেখুন বাবু, ইহারি জন্মে—এই মানুষেরি মুক্‌টির জন্মেই ত আমাদের যীশু প্রেরণ করেছেন। আপনায় ঢন্যবাড, আমরা খৃস্টান হবার আগে ঠেকেই হেলেনকে বালো বালো কাজ শেকাচ্ছে!

মেজ-বৌ হঠাৎ অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "আমি কি আপনার সাথে দেখা করতে পারি—যদি কোনো দিন ইচ্ছে হয়?"—বলেই সে তার অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি পূজারিণীর ফুলের মত আনসারের পানে তুলে ধরল।

আনসারের বুক কেন যেন দোল খেয়ে উঠল! এ কোন্ মায়াবিনী? সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "নিশ্চয়ই, যখন ইচ্ছা দেখা করবেন। আমাকে আপনার কোনো ভয় নাই। আপনার এই ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনে আমি অন্তত এতটুকু দুঃখিত নই। আপনার মত মেয়েকে তার যোগ্য স্থান দেবার মত জায়গা আমাদের এই অবরোধ-ঘেরা সমাজে নেই—

এ আমি আপনাকে দেখে এবং দুটি কথা শুনেই বুঝেছি!"—বলেই একটু থেমে আবার বললে, "আপনি যে ধর্মে থেকে শান্তিলাভ করেন —করুন, আমার শুধু একটি প্রার্থনা, আপনারই চারপাশের এই হতভাগ্যদের ভুলবেন না—আপনার হাত দিয়ে যদি ওদের একজনেরও এক দিনের দুঃখও দূর হয়—তবে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না! আপনার মত সাহসী মেয়ে পেলে যে কত কাজই করা যায়!"

মেজ-বৌ তার চোখমুখ মুছে ভরা কণ্ঠে ব'লে উঠল, "আমায় দিয়ে আপনার কোনো কাজের সাহায্য যদি হয়, জানাবেন, আমি সব করতে পারব আপনার জন্য!"—কিন্তু ঐ 'আপনার জন্য' কথাটা বুঝি তার অগোচরেই বেরিয়ে এসেছিল। ঐ কথাটা বলবার পরই তার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠল।

আনসারের মনে হল, সে যেন কোন নদী আর সাগরের মোহনায় উত্তাল তরঙ্গ-মধ্যে এসে পড়েছে! সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, "আমায় হয়ত আপনি ভাল করে চেনেন না, লতিফা আমারই বোন। যদি ওখানে কোনোদিন যান, আমার সব কথা শুনবেন। আর দেখাও ওখানেই করতে পারেন—ইচ্ছা করলে।"

মেজ-বৌ ঠোঁটে হাসি চেপে বলে উঠল, "আপনাকে আমি ভাল ক'রেই চিনি। আমি ওখানেই দেখা করব গিয়ে। কিন্তু যেতে দেবেন ত ওখানে খৃস্টান্‌নীকে ?"

আনসার কিছু উত্তর দেবার আগেই মেজ-বৌর ছেলেমেয়ে দুটি কোথা থেকে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "মা, তুই ইখেনে এয়েছিস আর আমরা খুঁজে খুঁজে মরছি!"

মেজ-বৌ তাদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ভারী গলায় বলে উঠল, "এই দুটোই আমার শত্রু! এখানে এসে তবু দু-বেলা দুটো খেতে পাচ্ছে! ওদের উপোস করা সহ্য করতে না পেরেই আমি এখানে এসেছি!"

আনসার তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে মেজ-বৌর ছেলেমেয়েকে একেবারে তার বুকে তুলে চুমো খেতে খেতে বললে, "তোরা কি খেতে ভালবাসিস বল্ ত? দুই শিশুতে মিলে তারস্বরে যে-সব ভাল জিনিসের লিষ্টি দিলে, তা শুনে ঘরের সকলেই হেসে উঠল। কিন্তু হাসলেও আনসারের এই ব্যবহারে সকলের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অতি সামান্য ঘরের ছেলেমেয়েদের কোলে তুলে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবকের এই এত সহজভাবে চুমো খাওয়া তারা যেন দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না!

যাদুকরী মেজ-বৌর মনে হতে লাগল, তার এত দিনের এত অহঙ্কার আজ ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল। তাকে শ্রদ্ধা করবার মত মানুষও আছে জগতে! সে তার চেয়েও বড় যাদুকর। তার কেবলি ইচ্ছা করতে লাগল, দু-হাত দিয়ে, এই পাগলের পায়ের ধুলো নিয়ে চোখে মুখে মেখে ধন্য হয়, কিন্তু লজ্জায় পারল না। আর কেউ না থাকলে হয়ত সে সত্যি সত্যিই তা করে ফেলত।

শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা এবং তারো অতিরিক্ত কিছু তার সুন্দর চক্ষুকে সুন্দরতর ক'রে তুলেছিল। তার সারা মুখে যেন কিসের আভা ঝলমল করছিল।

আনসার দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মাধুরী যেন বুভুক্ষুর মত

পান করতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সচকিত হয়ে মেজ-বৌর ছেলে-মেয়ের হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, "এখন আসি!" ব'লেই সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ক'রে বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য্য, এবার মেজ-বৌও সলজ্জ হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। আনসারের উষ্ণ করস্পর্শে তার সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে তার মনে হ'ল, এই নিমিষের স্পর্শ-বিনিময়ে সে আজ ভিখারিণী হয়ে গেল! সে তার সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দিল!

মিস জোন্স এবং পাদরী সাহেব এ সবই লক্ষ্য করছিল। এইবার পাদরী সায়েব একটু অসহিষ্ণু হয়েই মেজ-বৌর ছেলেমেয়েকে আদেশের স্বরে বলে উঠল, "এই! টোমরা ও টাকা এখনি ফিরিয়ে ডিয়ে এস!"

সঙ্গে সঙ্গে মেজ-বৌ ব'লে উঠল, "না, তোরা চ'লে আয়! তোদের ফিরিয়ে দিতে হবে না!"—ব'লেই ছেলেমেয়েদের হাত ধরে সে-ও বেরিয়ে গেল।

পাদরী সাহেব বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মিস জোন্সকে ইঙ্গিতে ডেকে বহু পরামর্শের পর স্থির হ'ল, মেজ-বৌকে শীগ্‌গিরই অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে।

মেজ-বৌ রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দেখল, একপাল-ছেলেমেয়ে নিয়ে আনসার বিস্কুট কিনছে সামনের দোকান থেকে। সে একটু হাসল, সেই যাদুভরা হাসি! তারপর যেতে যেতে বলল, "কাল সন্ধ্যায় বাড়ী থাকবেন, আমি যেমন করে পারি যাব।"

আনসার হেসে বললে, "ধন্যবাদ মিসেস হেলেন।"

মেজ-বৌ তিরস্কার-ভরা চাউনি হেনে চ'লে গেল।

আনসারের আজ পথ চলতে চলতে মনে হ'ল, এই ধরণীর দুঃখ বেদনা অভাব—সব যেন সুন্দর সুমধুর! এই পৃথিবীতে দুঃখ ব'লে কিছু নেই, ও-যেন আনন্দেরই আর একটা দিক। সুরার মত এর আনন্দ তিক্ত জ্বালাময়! এ সুরা যারা পান করেছে, তাদের আনন্দ সুখী মানব কল্পনাও করতে পারে না। তার পকেট উজাড় করে সে আজ রাস্তার ছেলেমেয়েদের বিস্কুট বিলাতে বিলাতে এল। ঐ ময়লা রুক্ষকাে ছেলেমেয়ে—ওরা ওদের সুন্দর মায়ের সন্তান। ঐ যে মেয়েটি তাকে দেখে ঘোমটা দিয়ে চলে গেল, কি অপরূপ সুন্দর সে! এই পৃথিবী যেন সুন্দরের মেলা। মনে পড়ল, অমনি সুন্দর—তারো চেয়ে সুন্দর রুবিকে—মেজ-বৌকে।

তার দু-চোখের দুই তারা—প্রভাতী তারা, সন্ধ্যাতারা—রুবি আর হেলেন, হেলেন আর রুবি!…

সে মানুষের জন্য সর্ব্বত্যাগী হবে, সকল দুঃখ মাথা পেতে সহ্য করবে, তারা দুঃখী তারা পীড়িত ব'লে নয়, তারা সুন্দর ব'লে। এ বেদনাবোধ শুধু ভাবের নয়, আইডিয়ার নয়, এ বোধ প্রেমের, ভালোবাসার।

(২০)

পরদিন যখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হ'য়ে এসেছে তখন মেজ-বৌ গায়ে বেশ করে চাদর জড়িয়ে নাজির সাহেবের বাড়ীর দিকে চলতে লাগল। কিসের যেন ভয়, কিসের যেন লজ্জা তার পা দুটোকে কিছুতেই মাটি ছাড়িয়ে উঠতে দিচ্ছিল না। গাঢ় অন্ধকারের পুরু আবরণও যেন তার লজ্জাকে ঢেকে রাখতে পারছিল না।

নাজির সাহেবের দ্বারে এসে হঠাৎ আনসারের স্বরে চমকিত হয়ে তার মনে হল, এখনি সে ছুটে পালিয়ে যেতে পারলে বুঝি বেঁচে যায়! তার আজকার এই পরিপাটী ক'রে বেশবিন্যাস যেন তার নিজের চোখেই সব চেয়ে বিসদৃশ—লজ্জার ব'লে ঠেকল। কিন্তু তখন আর ফিরবার উপায় ছিল না।

আনসারের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে লতিফা মেজ-বৌকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে তার হাত ধ'রে ভিতরে নিয়ে গেল। লতিফা কিছু বলতে পারলে না, কেবল তার চোখ কেন যেন ছলছল ক'রে উঠল। মেজ-বৌও তার অশ্রু আর গোপন রাখতে পারলে না।

আনসার উদাসভাবে বুঝি-বা অন্ধকার আকাশের লিপিতে তারার লেখা পড়বার চেষ্টা করছিল।

নাজির সাহেবকে লতিফার হুকুমে প্রয়োজন না থাকলেও বাইরে যেতে হয়েছিল।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। কেবল লতিফার করতলগত হয়ে

মেজ-বৌর উষ্ণ করতল পীড়িত হতে লাগল। সে যেন হাতে হাতে কথা কওয়া।

লতিফা ধরা-গলায় জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ছেলেদের আনলে না?"

মেজ-বৌ সেই পুরানো মধুর হাসি হেসে বললে, "না। তা হ'লে কি আর বসতে দিত? এতক্ষণ তার দাদির কাছে যাবার জন্য কান্নাকাটি লাগিয়ে দিত।" ব'লেই একটু থেমে আবার বললে, "কি ভয়ে-ভয়েই না এসেছি ভাই। বাড়ীর কাছটাতে এসে পা যেন আর চলতে চায় না।"

এইবার আনসার কথা বললে, "যাক আপনার খুব সাহস আছে বলতে হবে। আমি ত মনে করেছিলাম, আপনি আসতেই পারবেন না।"

লতিফা হেসে বললে, "দোহাই দাদু, ওকে আর 'আপনি' ব'লে লজ্জা দিও না।" তারপর মেজ-বৌর দিকে ফিরে বললে, "কি ভাই, তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে, না?"

মেজ-বৌ হেসে ফেলে বললে, "আমি তোমার বড় দিদির চেয়েও হয়ত বড় হব।"

আনসার হেসে বললে, "তোমাদের বয়সের হিসেবটা পরেই না হয় ক'রো দাঁত-টাঁত দেখে। এখন কাজের কথা হোক।"

মেজ-বৌ একটু নিম্নস্বরে ব'লে উঠল, "কিন্তু কাজের কথা বলতে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে কারুর যদি বয়স ধরা প'ড়ে যায়?"

আনসার হেসে ফেলে বললে, "ঘাট হয়েছে আমার। এখন বল ত তোমার মতলব কি? তুমি কি করবে?"

মেজ-বৌ নখ দিয়ে খানিকক্ষণ মাটি খুঁটে মুখ নীচু ক'রেই বললে,

"করব আর কি! আমার যা করবার তা ত এখন ঠিক ক'রে দেবে ঐ সায়েব-মেমগুলোই। তারা আমায় কালই বোধ হয় বরিশাল বদলি করবে।"

লতিফা হয়ত একটু বেশি জোরেই মেজ-বৌর হাত টিপে ফেলেছিল; মেজ-বৌ 'উঃ' ক'রে উঠল। লতিফা হেসে বললে, "এত অল্পতে তোমার বেশি লাগে, তবু তুমি আমাদের—তোমার এই চিরকেলে ভিটে ছেড়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া, তুমি কি দারোগা, মুন্সেফ যে তোমায় বদলি করবে?"

মেজ-বৌ কেমন-একরকম স্বরে ব'লে উঠল, "দারোগা-মুন্সেফ নই ভাই, চোরাই মাল। বদলি কথাটা ভুল বলেছিলাম, সাবধানের মার নেই, তাই একটু সামলে রাখছে আগে থেকেই।"

লতিফা হো হো ক'রে হেসে বললে, "এরি মধ্যে চোর টোরে ঘরের বেড়া কাটতে আরম্ভ করেছে নাকি?" ব'লেই লজ্জা পেয়ে সপ্রতিভ হ'বার ভান ক'রে উঠে যেতে যেতে বলল, "একটু বস, আমি একটু চা ক'রে আনি। নইলে ঐ লোকটির মেজাজকে তিন দিন ধরে জলে চুবিয়ে রাখলেও আর নরম হবে না।"

লতিফা চ'লে গেল। মেজ-বৌ উঠে গেল না, বা উঠে যাবার চেষ্টাও করল না। তার সব চেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল তার সেদিনকার সুন্দর ক'রে কাপড় পরার ঢঙটা। সে বুঝতে পারছিল, তার যত্ন ক'রে আঁকা যে-তিলগালে কাজলের তিলকটুকুও যেন আনসার লক্ষ্য করছে।

আনসার হঠাৎ ব'লে উঠল, "তুমি আমার কথা রাখবে!"

মেজ-বৌ প্রথমে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত

স্বরে ব'লে উঠল, "কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকলেও ত রাখতে পারব না।"

আনসার মেজ-বৌর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "সত্যিই কি তুমি এদেশ ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারবে?"

মেজ-বৌ আনসারের দিকে বড় বড় চোখ তুলে বললে, "আর দুদিন আগে গেলে হয়ত এত কষ্ট হত না। কিন্তু, ইচ্ছা থাকলেও ত আমি আর ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আবার মুসলমান হয়ে ফিরে আসি—আপনি হয়ত এই বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু আমায় জায়গা দেবে কে?"

আনসার নির্ব্বাক হয়ে ব'সে রইল। সত্যই ত সে স্বধর্ম্মে ফিরে এলে আরো অসহায় অবস্থায় পড়বে। তার শ্বশুর-বাড়ীর কুটিরে তার আর স্থান হবে না। দু-দিনের জন্য হলেও কথার জ্বালায় গঞ্জনার চোটে টিকতে পারবে না।

হঠাৎ আনসার যেন অকূলে কূল পেল। সে সোজা হয়ে ব'সে উৎফুল্ল কণ্ঠে ব'লে উঠল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তুমি এইখানেই আলাদা ঘর বেঁধে থাক—আমি ব্যবস্থা ক'রে দেবো যাতে তোমার দিন নিশ্চিন্তে চ'লে যায়।"

মেজ-বৌ একটু হেসে বললে, "আমায় আপনি আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন জানাজানি হ'লে আমাদের কি অবস্থা হবে—বুঝেছেন? আমি না হয় সইলাম সে সব, কিন্তু আপনি—"

আনসার মেজ-বৌয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, "সে ভয় আমি করিনে। তা ছাড়া, আমি ত এখানে চিরকাল থাকছিনে। বৎসরে

দু-বৎসরে হয়ত একবার ক'রে আসব। অবশ্য এমন ব্যবস্থা ক'রে যাব, যাতে ক'রে আমি যেখানেই থাকি, তোমায় যেন কোন কষ্টে না পড়তে হয়।"

মেজ-বৌয়ের চোখ জলে ঝাপসা হ'য়ে উঠল। এ তার দুঃখের অবসানের আনন্দে, না আনসারের অনাগত বিদায়-দিনের আভাসে— সে-ই জানে।

হঠাৎ মেজ-বৌ যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কান্নাকাতর কণ্ঠে সে ব'লে উঠল, "যাবেই যদি তবে এ ঋণের বোঝা চাপিয়ে যেয়ো না। আমিও কাল চ'লে যাই, তুমিও চ'লে যাও।"

ব'লেই সে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল। আনসার একটা কথাও বলতে পারলে না। প্রস্তর-মূর্ত্তির মত ব'সে রইল। তার কেবলই মনে হ'তে লাগল, ঐ দূর ছায়াপথের নীহারিকা-লোকের মতই নারীর মন রহস্যময়।

(২১)

পরদিন সকাল না হতেই কৃষ্ণনগরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল! দলে দলে পুলিশ এসে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন বাড়ীতে খানাতল্লাস করতে লাগল। বহু ছাত্র ও তরুণকে হাজতে পুরল।

আনসারকে ধরবার জন্যে সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ সারা রাত্রি ধরে বাগানের গাছে, নাজির সাহেবের বাড়ীর আনাচে কানাচে পাহারা দিচ্ছিল, ভোর না হতেই তারা ঘুমন্ত আনসারকে বন্দী করল।

শহরময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল, নাজির সাহেবের শালা আনসার রুশিয়ার বল্‌শেভিক-চর ও বিপ্লবী-নেতা। সে ছেলেদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রচার করছিল এবং তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করছিল।

সবচেয়ে বেশি ঘামতে লাগলেন সেই সব ভদ্রলোক, যাঁরা নিজে বা তাঁদের কোন আত্মীয় ধরা পড়ে নাই। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, "বাবা! খুব বাঁচা গেছে! যে রকম জাল ফেলেছিল পুলিশ! মনে হচ্ছিল, গুগ্‌লি শামুক পর্য্যন্ত বাদ দেবে না।"

ওরি মধ্যে একজন ব'লে উঠলেন, "আমরা চুনোপুঁটি ভায়া, চুনো-পুঁটি, ওরা রুই-কাতলাই ধরতে এসেছিল!"

আর-একজন একটু মাত্রা চড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ দাদা, সরকার খলিফা ছেলে, ও ছুঁচো মে'রে হাত গন্ধ করে না! মশা মারতে কামান দাগে না!"

স্বদেশ-ব্রত বীরের দল গালি খেতে লাগল, তাদের তথাকথিত হঠকারিতার জন্য—তাদেরই কাছে বেশি, যাদের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করবার জন্য তাদের সুখের গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন হ'তে হয়ত চিরকালের জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল!

আনসারের ধৃত হওয়ার সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল এবং সবাই জানতে পারল যে, আনসার এখনও বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় আছে। দলে দলে মেথর-কুলি, গাড়োয়ান-কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল নাজির সাহেবরে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল। পুলিশের মার-গুঁতো চাবুক লাথিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তারা নাজির সাহেবের ঘর ঘিরে ফেললে। পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে দু-একটা ফাঁকা আওয়াজও করলে বন্দুকের। কিন্তু কেউ এক পাও পিছুল না। ওরি মধ্যে একটা বৃদ্ধ মেথর চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, 'হুজুর, আমাদের বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওর চেয়ে মার আর কি আছে? আমাদের বুকে বরং গুলি মার, আমাদের বাবাকে ছেড়ে দিয়ে যাও!"

ওর ক্রন্দন শুনে কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারলে না!

বাইরে জন-সঙ্ঘ ক্রন্দন-কাতর কণ্ঠে আকাশ-ফাটা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল! ও যেন বিক্ষুব্ধ গণ-দেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হুঙ্কার!

আনসারের চোখের কানায় কানায় অশ্রু টলমল ক'রে উঠল। সে তার শৃঙ্খলাবদ্ধ কর ললাটে ঠেকিয়ে জনসঙ্ঘের উদ্দেশে নমস্কার ক'রে ব'লে উঠল, "আমি জানি, তোমাদের জয় হবে, হবে! তোমাদের কণ্ঠে স্বাধীন মানবাত্মার শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছি!"

প্রমত্ত জনসঙ্ঘকে কিছুতেই টলাতে না পেরে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

আনসারের কাছে এসে বললে, "আপনি যদি কিছু বলেন ওদের, তাহলে বোধ হয় ওরা চ'লে যাবে! নইলে বাধ্য হয়ে আমাদের গুলি চালাতে হবে!"

আনসার হেসে বললে, "আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু গুলির ভয়ে আমি যাচ্ছি না। গুলি যদি সত্যই চালাবেন মনস্থ ক'রে থাকেন তা হ'লে গুলি চালান!" ব'লেই হেসে বললে, "আমরা গুলিখোরের জাত! ওটা ধাতে সয়ে গেছে!"

সায়েব একটু হেসে বললে, "গুলি সত্য-সত্যই চালাতে চাই না। কিন্তু আপনাকে ত থানায় যেতে হবে। ওরা আমাদের কর্ত্তব্য কাজে হয়ত বাধা দেবে!"

আনসার তেমনি হেসে বললে, "তা হ'লে আপনারাও আপনাদের কর্ত্তব্য করবেন! কিন্তু তা বোধ হয় করতে হবে না। চলুন!"

শৃঙ্খলাবদ্ধ আনসারকে দেখেই উন্মত্ত জনগণ বিপুল জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। আনসার তাদেরে হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বললে, "তোমরা ফিরে যাও! ভয় নেই, আমার ফাঁসি হবে না! আবার আমি ফিরে আসব তোমাদের মাঝে!" একটু থেমে উদ্গত অশ্রু কষ্টে নিরোধ ক'রে বললে, "আমার নিজের জন্য কোনো দুঃখ নেই ভাই, কারণ আমার জন্য দুঃখ করবার কেউ নেই—"

অমনি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, "আছে, আছে! আমরা আছি!"

আনসার হেসে বললে, "জানি, তোমরা আছো। কিন্তু তোমরা ত আমার জন্য কাঁদবার বন্ধু নও! আমি যদি পরাজিতই হয়ে থাকি, তোমরা জয়ী হয়ে আমার সে পরাজয়ের লজ্জা মুছে দেবে!"

অমনি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

পুলিশ সাহেব অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেই আনসার বললে, "ভয় পাবেন না, আমি ওদেরে ক্ষেপিয়ে তুলব না, শান্তই করব!"

তারপর জনগণের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, "বন্ধুগণ! আমার বিদায় কালে তোমাদের প্রতি আমার একমাত্র অনুরোধ, তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবি কিছুতেই ছেড়ো না! তোমাদেরও হয়ত আমার মত ক'রেই শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সকল রকমে কষ্ট দেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ো না! আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্য স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি! অস্ত্র তোমাদের নেই, তার জন্য দুঃখ ক'রো না। যে বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রাণশক্তির অভাব যদি না হয় তোমাদের, তোমরাও জয়ী হবে। আর অস্ত্রই বা নাই বলব কেন? কোচোয়ান! তোমার হাতে চাবুক আছে? বুনো ঘোড়াকে—পশুকে তুমি চাবুক মেরে শায়েস্তা কর, আর মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবে না? রাজমিস্ত্রী! তোমার হাতেব কন্নিক দিয়ে, ফুটগজ দিয়ে এত বাড়ী ইমারত তৈরি করতে পারলে, বুনো প্রকৃতিকে রাজলক্ষ্মীর সাজে সাজালে,—পীড়িত মানুষের নিশ্চিন্তে বাস করার স্বর্গ তোমরাই রচে তুলতে পারবে। আমার ঝড়ুদার মেথর ভাইরা! তোমরাই ত নিজেদের অশুচি অস্পৃশ্য ক'রে পৃথিবীর শুচিতা রক্ষা করছ, নিজে সমস্ত দূষিত বাষ্প

গ্রহণ ক'রে আয়ুক্ষয় ক'রে আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ, আমাদের চার পাশের বাতাসকে নিষ্কলুষ ক'রে রেখেছ! তোমরা এত ময়লাই যদি পরিষ্কার করতে পারলে—তা হলে এই ময়লা-মনের ময়লা মানুষগুলোকে কি শুচি করতে পারবে না? তোমাদের মত ত্যাগী করতে পারবে না? তোমাদের ঐ ঝাড়ু দিয়ে ওদের বিষ-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না? · তুমি চাষা? তুমি যে হাল দিয়ে মাটির বুকে ফুলের ফসলের মেলা বসাও, সেই হাল দিয়ে কি এই অনুর্ব্বর-হৃদয় মানুষের মনে মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে পারবে না?"

জনসঙ্ঘ মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করতে লাগল! সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিশ সাহেব বাধা দিল।

আনসার হেসে বললে, "ভয় নেই সাহেব! এ-রকম বক্তৃতা অনেক দিয়েছি, কিন্তু ঐ জয়ধ্বনি শোনা ছাড়া ওদেরে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারিনি। আজও পারব না। ক্ষেপানোর মানুষ আমার পিছনে আসছে! আমার মুখ ত বহুদিনের জন্যই এখন বন্ধ ক'রে দেবে, যাবার বেলায় না হয় একটু আলগাই করলুম! যাক, আমি আর কিছু বলব না, এবার ওদেরে ফিরে যেতেই বলব!"

ব'লেই জনসঙ্ঘের দিকে ফিরে বললে, "আমার অনুরোধ, তোমরা ফিরে যাও। আমার পিছনে যদি যেতে হয়, ত সে পথ শুধু ঐ থানাটুকু বা তারো বেশি জেল পর্য্যন্ত কিন্তু তোমাদের দেশ-লক্ষ্মীকে খুঁজতে হলে স্বর্ণ-লঙ্কা পর্য্যন্ত যেতে হবে। স্বর্গে উঠে যেতে হবে, পাতালে নেমে যেতে হবে!"

তারপর পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললে:

"এই বেচারারা তোমাদের আমাদের মতই হতভাগ্য, দুঃখী। পেটের দায়ে পাপ করে, দেশদ্রোহী হয়। ওদের ক্ষমা কর, দুদিন পরে ওরাও আসবে তোমাদের কম্‌রেড হয়ে! যে মৃত্যুক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য ও বাঁচাবার সাধ্য কারুরই নেই! তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য এখানে আসনি, তোমাদের সে মন্ত্র আমি কোন দিনই শিখাইনি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার কর—সেই হবে আমারও বড় উদ্ধার! তোমাদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমিও হব মুক্ত! এসেছ, নমস্কার নাও, আমার দোষ-ত্রুটি-অপরাধ ক্ষমা কর, তারপর যদি আসতেই হয় আমার পথে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে! বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্ত্তের জোয়ারের রূপে এসো না! আমি ভেসে চললুম, দুঃখ নেই, কিন্তু তোমরা এসো! নমস্কার!

উপস্থিত সকলেই জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ললাটে কর ঠেকিয়ে সালাম ও নমস্কার করল।

পুলিশ আনসারকে নিয়ে গেল। আশ্চর্য্য! কেউ আর বাধা দিল না! থানাতেও গেল না! বজ্রগর্ভ মেঘের মত ধীর শান্ত গতিতে নিজ নিজ পথে চ'লে গেল।

যাবার সময় সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল—লতিফাকে নিয়ে! সে কেবলি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছিল। আনসার যখন গেল, তখনো সে মূর্চ্ছিতা। আনসার নীরবে ধূলায় লুণ্ঠিতা তার ললাটে শিরে বারবার হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, "বুঁচি, ওঠ্ ওঠ্! তুই অমন করিসনে! আমি আবার আসব!" আনসারের অশ্রু-সাগরে যেন অমাবস্যার রাতের জোয়ার উচ্ছসিত হয়ে উঠল!....

পরদিন প্রত্যূষে রাণাঘাট ষ্টেশনে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় আনসার যখন গাড়ী বদল করছিল, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল অদূরের কয়েকটি যাত্রীর প্রতি। তারা আর কেউ নয়, মিস জোন্স, মেজ-বৌ, প্যাঁকালে এবং কুর্শি!

মিস জোন্স এগিয়ে এসে হাসি চেপে বললে, "আপনার এ অবস্থা দেখে দুঃখিত, মিষ্টার আনসার!"

আনসার হেসে বললে, "ধন্যবাদ! তারপর, ওদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?" মিস জোন্স বললে, "বরিশালে। আপনাদের মেজ-বৌ ত কাল বেঁকে বসেছিল, সে আর গির্জ্জায় থাকবে না। আবার মুসলমান হবে, ঘরে ফিরে যাবে! সে কি কান্না, মিষ্টার আনসার! কিন্তু আজ সকালে দেখি, এসে বললে—সে এদেশে থাকতে চায় না! আজ কিন্তু সারাদিন কেঁদেছে ও! ওর মাথায় বোধ হয় ছিট আছে, মিস্টার আনসার! হাঁ, আর আপনি শুনে বোধ হয় খুশি হবেন, কাল প্যাঁকালেও আমাদের পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছে। কুর্শির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে! যীশুখ্রীষ্ট ওদের সুখী করুন! গুড বাঈ!"

ট্রেন এসে পড়ল। আনসার দেখতে পেল, ইঞ্জিনের অগ্নিচক্ষুর মতই অদূরে দুটি চক্ষু জ্বলছে! মৃত্যু-ক্ষুধার মত সে চাউনি জ্বালাময়, বুভুক্ষু, লেলিহান! সে চোখে অশ্রু নাই, শুধু রক্ত!

ট্রেন ছেড়ে দিল। আনসার তার চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল, প্লাটফর্ম্মে কাকে যেন অনেকগুলো লোক আর মিস জোন্স ধরাধরি ক'রে তুলছে।

রেলগাড়ীর ধোঁয়ায় আনসারের চোখ, প্লাটফর্ম্ম সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল!

---

(২২)

সেই মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর! সেই ধূলা-কাদার চাঁদ-সড়ক! শুধু সড়কই আছে, চাঁদ নেই! সবাই বলে, দুদিনের জন্য চাঁদ উঠেছিল, রাহুতে গ্রাস করেছে! ব'লেই আশ-পাশে তাকায়। বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং রাজকুলেষু!

সেই 'ওমান কাৎলি' পাড়া, সেই বাগান, পুকুর পথ, ঘাট, কোঁদল, কাজিয়া সব আছে আগেকার মতই। শুধু যারা কিছুতেই ভুলতে পারে না তারা ছাড়া, আর সকলেই মেজ-বৌ, কুঁশি, প্যাকালে, আনসার—সবাইকে, সব কিছুকে ভুলে গেছে। স্মরণ রাখার অবকাশ কোথায় এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মাঝে!

অগাধ স্রোতের বিপুল আবর্ত্তে প'ড়ে যে হাবুডুবু খেয়েছে, সে-ই জানে—কেমন করে আবর্ত্তের মানুষ এক মিনিট আগে হারিয়ে-যাওয়া তারই কোলের শিশুসন্তানের মৃত্যু-কথা ভুলে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করে!

নিত্যকার একটানা দুঃখ-অভাব-বেদনা-মৃত্যুপীড়া অপমানের পঙ্কিল স্রোতে, মরণাবর্ত্তে যারা ডুবে মরছে, তাদের অবকাশ কোথায় ক্ষণপূর্ব্বের দুঃখ মনে ক'রে রাখার? ওরা কেবলি হাত-পা ছুঁড়ে অসহায়ের মত আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত!

কিন্তু জীবনের সকল আশা-ভরসার জলাঞ্জলি দিয়ে যে মৃত্যুর মুখে

নিশ্চিন্তে আত্ম-সমর্পণ করে, সেই শেষ নির্ভরতার চরম মুহূর্তে বুঝিবা তারও স্মরণ-পথে ভিড় ক'রে আসে—সেই চ'লে যাওয়ার দল—যারা সারা জীবন তারই আগে-পিছে তার প্রিয়তম সহযাত্রী ছিল!

শোকে জরায় অনাহারে দুঃখে প্যাঁকালের মা শয্যা নিয়েছে। সে কেবল বলে, "দেখ বড়-বৌ, জ'ন্মে অবধি এমন শুয়ে থাকার সুযোগ আর আরাম পাইনি...কাল থেকে এই একপাশেই শুয়ে আছি, মনে হচ্ছে এ ধারটা পাথর হয়ে গিয়েছে, তবু কি আরামই না লাগছে!... আর কারুর জন্যই ভাবি না, তোদের জন্যেও না, আমার জন্যেও না, কারুর জন্যেও না।...খোদা যা করবার, করবেন! পানিতে লাঠি মেরে তাকে কেউ ফিরাতে পারে না! যা হবার, তা হবেই!"—ব'লেই সে নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ সে দার্শনিক হয়ে ওঠে, দুঃখ ভোলার বড় বড় কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় —যা জীবনে তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। ব'লেই সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যায়! প্রশান্ত হাসিতে মুখ-চোখ ছলছল ক'রে ওঠে! ও যেন সারা রাত্রি ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে পোড়া তৈলহীন প্রদীপের সলতের মত নিববার আগে হঠাৎ জ্বলে ওঠা!

বড়-বৌ চোখ মোছে। জল এলেও মোছে, না এলে লজ্জায় চোখ ঢাকার ছলনায় মোছে।

ঐ টুকু ত দুটো চোখ, কত জলই বা ওতে ধরে। যে রক্ত চুঁয়ে ঐ চোখের জল ঝরে, সেই রক্তই যে ফুরিয়ে গেছে।

মেজ-বৌর পরিত্যক্ত সন্তান দুটি আঙিনায় খেলা করে; কেমন যেন নির্লিপ্ত ভাব ওদের কথায়-বার্ত্তায় চলা-ফেরায় চোখে মুখে ফুটে উঠে।

মাতৃহারা বিহগ-শাবক যেন অন্য পাখীদের সঙ্গে থেকেও দলছাড়া হয়ে ঘু'রে ফেরে কি যেন চায়, কাকে যেন খোঁজে—তেমনি।

খানিক খেলা করে, খানিকক্ষণ কাঠ কুড়োয়, খানিক অলসভাবে গাছের তলায় প'ড়ে ঘুমোয়, ঘুমিয়ে উঠে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে, তারপর বুকফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরে। ঘরে এসেই কাকে যেন খোঁজে, কি যেন প্রত্যাশা করে, পায় না। বড়-বৌর ছেলে-মেয়েরা ভাব করতে আসে, ভালো লাগে না। বড়-বৌ আদর করতে আসে, কেঁদে ওরা হাত ছাড়িয়ে নেয়। অকারণ আখোট করে।

সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা আস্তে আস্তে রুগ্না শয্যাশায়ী দাদির কাছে এসে বসে। ছেলেটি গম্ভীর ভাবে বলে, "দাদিমা, আজ ভাল আছিস ?" বৃদ্ধা হেসে বলে, "আর দাদু, ভাল! এখন চোখ দুটো বুঁজলেই সব ভাল-মন্দ যায়!" তারপর দার্শনিকের মত শান্ত স্বরে বলে, "দেখ্ দাদু, আমি চলে গেলে তোরা কেউ কাঁদিস না যেন। মানুষ জন্মালে মরে। ছেলেমেয়ে মা-বাপ কারুর কি চিরদিন থাকে!"

শ্রীমান দাদু এ-সবের এক বর্ণও বোঝে না, হাঁ করে চেয়ে থাকে!

মা-বাপের নাম শুনতেই ঢুলতে ঢুলতে খুকী ব'লে ওঠে, "দাদি, তুই আব্বার কাছে যাবি? আচ্ছা দাদি, আব্বা যেখানে থাকে সেই যেন বেশি দূর, না, মা যেখানে থাকে সেই বরিশাল বেশি ?"

শান্ত বৃদ্ধা ছটফট ক'রে ওঠে। একটা ভীষণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে বলে, "ঐ বরিশালই বেশি দূরে, ঐ বরিশালই বেশি দূর!"

খুকী বুঝতে পারে না। তবু ক্লান্ত-কণ্ঠে বলে, "তা হলে আমি আব্বার কাছে যাব। আচ্ছা দাদি, আব্বার কাছে যেতে হলে ক'দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়? তুই ত বিছানায় শুয়ে অসুখ করেছিস, তারপর সেখানে যাচ্ছিস! আমারও এইবার অসুখ করবে, তারপরে আব্বার কাছে চলে যাব! মা ভালবাসে না, খেরেস্তান হয়ে গিয়েছে! হারাম খায়! থুঃ! ওর কাছে আর যাচ্ছি না, হুঁ হুঁ!"

বৃদ্ধা শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে! মনে হয়, কামারশালে বুঝি পোড়া কয়লা জ্বলাতে হাপরের শব্দ হচ্ছে!

দাওয়ার মাটিতে শুয়ে পড়ে জড়িত কণ্ঠে খুকী আবার জিজ্ঞাসা করে, "হেঁ দাদি, আব্বা যেখানে থাকে সেখানে সন্ধ্যা বেলায় কী খেতে দেয়? আমি বলি দুধ ভাত, হান্‌পে বলে গোশ্‌ত-রুটি!"...কিন্তু দাদির উত্তর শোনার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে!

ছেলেটি জেগেই থাকে। কি সব ভাবে, মাঝে মাঝে রান্না ঘরের দিকে চায়! সেখানে অন্ধকার দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না।

কিন্তু থাকতেও পারে না। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায়। দাদি চেঁচিয়ে ওঠে, "অ হান'পে, কোথায় যাচ্ছিস রে এই অন্ধকারে?" অন্ধকারের ওপার থেকে উত্তর আসে, "মজিদে শিন্নি আছে, আনতে যাচ্ছি।"

বড়-বৌ! মসজিদের দ্বার থেকে কোলে করে আনতে চায়, সে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। বলে,—"যাব না আমি শিন্নি খাব, আমার বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে গো! আমি যাব না।"

মসজিদের ভিতর থেকে মৌলবী সাহেবের কণ্ঠ ভেসে আসে। কোরানের সেই অংশ—যার মানে—"আমি তাহাদের নামাজ কবুল করি না, যাহারা পিতৃহীনকে হাঁকাইয়া দেয়!" মৌলবী সাহেব জোরে জোরে পাঠ করেন, ভক্তরা চক্ষু বুজিয়া শোনে!

অন্ধকার ঘরে ক্ষুধাতুর শিশুর মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যায়—আসন্ন-মৃত্যুর ছায়ার মত!

ঘুমের মাঝে খুকী কেঁদে ওঠে, "মাগো, আমি আব্বার কাছে যাব না! আমি তোর কাছে যাব, বরিশাল যাব!"

খণ্ড অন্ধকারের মত বাদুড় দল তেমনি পাখা ঝাপটে উড়ে যায় মাথার ওপর।—রাত্রি শিউরে ওঠে!

(২৩)

বহুদিন পরে লতিফার মুখে হাসি দেখা দিল। নাজির সাহেব অফিস থেকে এসেই ঘুমন্ত লতিফাকে তুলে বললেন, "ওগো, শুনেছ? রুবির বাবা যে নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এলেন!"

এক নিমেষে লতিফার ঘুম যেন কোথায় উড়ে গেল! সে ধড়মড়িয়ে উঠে বললে, "সত্যি বলছ? মিষ্টার হামিদ একা এলেন, না, রুবিও সঙ্গে আছে?"

ধড়া-চূড়া খুলতে খুলতে নাজির সাহেব বললেন, "তা ত ঠিক জানিনে। তবে কে যেন বললে, হামিদ সাহেবের ছেলে-মেয়েরাও এসেছে সঙ্গে।"

লতিফার চোখ কার কথা ভেবে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল! মনে মনে বলল, "সেই ত এলি হতভাগী, দু-দিন আগে এলে হয়ত একবার দেখতে পেতিস!"

পরদিন বিকালে লতিফার দোরে একখানা প্রকাণ্ড মোটর এসে দাঁড়াল। লতিফা দোরে এসে দাঁড়াইতেই, মোটর হতে এক শ্বেতবসনা সুন্দরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে নেমে এল।

লতিফা তাকে একেবারে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললে, "রুবি, তুই। তুই এমন হয়েছিস?" বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টস টস ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল!

রুবি ধমক দিয়ে বললে, "চুপ! কাঁদবি ত এখখুনি চলে যাব বলে দিচ্ছি! মাগো! তোদের চোখের জল যেন সাধা; কোথায় এতদিন পরে দেখা, একটু আনন্দ করবি, তা না কেঁদেই ভাসিয়ে দিচ্ছিস্!"

লতিফা চোখ মুছে বললে, "সেই রুবি, তুই এই হয়েছিস! তখন যে তোর মতন কাঁদুনে কেউ ছিল না লো আমাদের দলে! আর এখন এমনি পাথর হয়ে গেছিস?"

রুবি লতিফার গাল টিপে দিয়ে বললে, "পাথর নয় লো, বরফ! আবার গ্রীষ্মকাল এলেই গলে জল হয়ে যাব।" বলেই তার ছেলেমেয়েদের আদর করে, চুমু খেয়ে, কোলে নিয়ে, চিমটি কেটে কাঁদিয়ে, তারপর মিষ্টি, কাপড় দিয়ে ভুলিয়ে—বাড়ীটাকে যেন সরগরম করে তুললে!

পাড়ার অনেক মেয়ে জুটেছিল, কিন্তু রুবির এক হুমকিতে সব যে যেখানে পারল সরে পড়ল! বাপ! ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে।

রুবি হেসে বলল, "জানিস বুঁচি, আমি বেশি লোক দেখতে পারিনে। একপাল লোক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, ভাবতেও যেন অসোয়াস্তি লাগে। ওদের তাড়িয়ে দিতে ক হয়, কিন্তু না তাড়িয়ে যে পারিনে ভাই।"

বুঁচি ওরফে লতিফা হেসে বললে, "তুই ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে, তাই ওরা অমন চুপ করে সরে গেল, নইলে এমন ভাষায় তোর তাড়নায় উত্তর দিয়ে যেত যে, কানে শীল-মোহর করতে ইচ্ছে করত।"

রুবি দুষ্টু হাসি হেসে বললে, "তা হলে তুই বেশ খাঁটি বাংলা শিখে ফেলেছিস এতদিনে?"

লতিফা হেসে ফেলে বললে, "হাঁ, তা আমি কেন, আমার ছেলে-

মেয়েরাও শিখে ফেলেছে! এমন বিশ্রী পাড়ায় আছি ভাই, সে আর বলিসনে। ছেলেমেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। কিন্তু ও কথা যাক্, ছেলে-মেয়েগুলোকে ছেড়ে একটু স্থির হয়ে বস্ দেখি, কত কথা আছে জানবার জানাবার। যেতে কিন্তু বেশি দেরি হবে, তোর মোটর ফিরে যেতে বল্, রাত্রে খেয়ে-দেয়ে যাবি।

রুবি আনন্দে ে লে-মানুষের মত নেচে উঠে সোফারকে গাড়ী নিয়ে যেতে বলল এবং ঝিকে ঐ সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তার মাকে ভাবতে মানা করে রাত্রি দশটায় গাড়ী আনতে বলে দিল।

রুবি ছুটে এসে লতিফার পালঙ্কের উপর সশব্দে শুয়ে পড়ে লতিফাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "বাস, এইবার আর কোনো কথা নয়। তুই তোর সব কথা বল, আমি আমার সব কথা বলি।" বলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "ও বাবা, এখুনি আবার তোর নাজির সাহেব আসবে বুঝি? ওকে কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে বাইরে ভাগিয়ে দিবি।"

তার কথা বলার ধরনে লতিফা হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, "দাঁড়া, মিনসে আসুক, তখন তোকে ধরিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ছি। কিন্তু ভয় নেই তোর, আজ উনি শিকারে বেরিয়েছেন! ফিরতে রাত বারটার কম হবে না।"

রুবি লতিফার পিঠ্ চাপড়ে বল্লে, "ব্রাভো! তবে আজ আমাদের পায় কে! গ্র্যাণ্ড গল্প ক'রে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।"

লতিফা হেসে বললে, "গল্প করলে ত পেট ভরবে না! তার চেয়ে বরং চল রান্নাঘরে আমি পরোটা করব, আর তুই গল্প করা

রুবি হেসে বললে, "তাই চল ভাই, কতদিন তোর হাতের রান্না খাইনি।"

পরোটার নেচি করতে করতে রুবি বললে, "আমি কি ক'রে তোর খবর পেলুম জানিস?" বলেই একটু থেমে বলতে লাগল, "একদিন কাগজে পড়লুম, তোদের বাড়ীতে মিঃ আনসারকে পুলিশ এ্যারেষ্ট করেছে!" ব'লেই রুবি হঠাৎ চুপ ক'রে গেল।"

লতিফার হাসি মুখ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "আমিও তোর কথা প্রথম শুনি দাদা ভাইয়ের কাছে। দাদু এখন ষ্টেট প্রিজ্‌নার হ'য়ে বন্দী আছেন, শুনেছিস্ বোধ হয়।"

রুবি তার ডাগর চোখের করুণ দৃষ্টি দিয়ে লতিফার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললে, "হাঁ জানি। খবরের কাগজে সব পড়েছি। আচ্ছা ভাই বুঁচি, অনু ভাই তোকে কিছু বলেছিল আমার সম্বন্ধে?"

লতিফা শান্তকণ্ঠে বলল, "হাঁ, বলেছিল। আচ্ছা রুবি, আমার কাছে লুকোবিনে, বল্?"

রুবি স্থির কণ্ঠে ব'লে উঠল, "দেখ ভাই বুঁচি, আমি আমার মনের কথা কারুর কাছেই গোপন রাখিনে। এর জন্য আমায় চরম দুঃখ পেতে হয়েছে, তবু মনকে চোখ ঠারতে পারিনি। তুই যা জিজ্ঞাসা করবি তা জানি!"

লতিফা রুবির দিকে খানিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই তোর স্বামীকে ভালবাসতিস?"

রুবি সহজ শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "না। সে ত আমার ভালবাসা

চায়নি। আমিও চাইনি। সে চেয়েছিল আমাকে বিয়ে ক'রে ধন্য করার দাবিতে বিলেত যাওয়ার পথ-খরচা। তা সে পেয়েছিল। কিন্তু কপাল খারাপ, সইল না, বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয় বুঁচি।" একটু থেমে আবার বলতে লাগল, "মৃত্যুর দিনকতক আগে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। এই ভুলই হয়ত তার কাল হ'ল। আমি সেবা-শুশ্রূষা সবই করেছি, অবশ্য আমাকে খুশি করতে নয়, তাকে আর আমার বাপ-মাকে খুশি করতে। কিন্তু এক দিন সে ধ'রে ফেলল আমার ফাঁকি! সে স্পষ্টই বলল, তুমি আমায় ভালবাস না এর চেয়ে বড় দুঃখ আমার আর নেই রুবি। আমার সবচেয়ে কাছের লোকটিই সবচেয়ে অনাত্মীয়, এ ভাবতেও আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হয়ত আমি বাঁচতুম, কিন্তু এর পরে আমার বাঁচবার আর কোন সাধ নেই।"

লতিফার যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল! সে আর বলতে না দিয়েই প্রশ্ন করল, "এ শুনেও তুই চুপ করে রইলি?"

রুবি তেমনি সহজ ভাবে নেচি করতে করতে বলল, "তা ছাড়া আর কি করব বল? একজন ভদ্রলোককে চোখের সামনে মরতে দেখলে কার না কষ্ট হয়! কিন্তু সে কষ্ট কোন দিনই আত্মীয়-বিয়োগের মত পীড়াদায়ক হয়নি আমার কাছে।"

লতিফা চমকে উঠল। যেন হঠাৎ সে গোখরো সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ইচ্ছা করেই সে এর পরেও আর কোনো প্রশ্ন করল না। তার মনে হতে লাগল, সে যেন ক্রমেই পাষাণ মূর্তিতে পরিণত হতে চলেছে। যা শুনল, যা দেখল, তা যেন কল্পনারও

অতীত। এমন নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি কোনো মেয়ে করতে পারে, ভাবতেও তার যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসতে লাগল!

রুবি অদ্ভুত রকমের হাসি হেসে বলে উঠল, "শুনে তোর খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার ওপর, না? তা আমার বাপ-মাই ঘেন্না করেন, তুই ত তুই। কিন্তু বুঁচি, তুই শুনে আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবি যে, যে দিন আনু ভাইকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে কাগজে পড়লুম, সেদিনই মনে হল, আমার সুন্দর পৃথিবীকে কে যেন তার স্থুল হাত দিয়ে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য লেপে মুছে দিয়ে গেল! ঐ একটি ছাড়া পৃথিবীতে আর কারুর জন্যই আমার কোনো দুঃখ বোধ নেই।"

বলতে বলতে তার স্থির-তীব্র চক্ষু অশ্রুভারে টলমল করে উঠল।

লতিফা একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলে উঠল, "কিন্তু ভাই, এ কি মস্ত বড় অন্যায় নয়?"

রুবি চোখের জল মুছবার কোনো চেষ্টা না ক'রে ততোধিক শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠল, "আমার হৃদয়-মনকে উপবাসী রেখে অন্যের সুখের বলি হতে না পারাটাই বুঝি খুব বড় অন্যায় হয় তোদের কাছে বুঁচি? হয়ত তোদের কাছে হয়, আমার কাছে হয় না। আমার ন্যায় অন্যায় আমার কাছে। অন্যকে খুশি করতে গিয়ে সব কিছু উপদ্রব নীরবে সইতে পারাটাই কিছু মহত্ব নয়! আমার বাপ-মার স্নেহ ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে গিয়েই ত আমি আজ এমন দেউলিয়া! আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের আনন্দের পথ বেছে নেবার আমারই কোনো অধিকার থাকবে না?" বলেই নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললে, "আমার

স্বামী মহৎ ভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে সারা জীবন দুঃখ পাওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেলেন!"

লতিফার মনে হতে লাগল পৃথিবী যেন টলছে। তার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। কোন রকমে কষ্টে সে বলতে পারল, "মেয়ে-মানুষ কী করে এমন নিষ্ঠুর হয়, আমি যে ভাবতেই পারছিনে রুবি! কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে!"

রুবি এইবার হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু সে হাসিতে কোনো রস-কশ নেই। ততক্ষণে নেচি তৈরী করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে হাত ধুতে ধুতে বলল, "দেখ্ বুঁচি, পানি চমৎকার শীতল পানীয় দ্রব্য, কিন্তু সেই পানি যখন আগুনের আঁচে টগবগ করে ফুটতে থাকে, তখন তা গায়ে পড়লে ফোসকা ত পড়বেই!—কিন্তু তোর তাওয়ায় যে ধোঁওয়া উঠে গেল, নে, এখন পরোটা কটা ভেজে নে!"

লতিফা যন্ত্র-চালিতের মত পরোটা হালুয়া চা তৈরি করে রুবির সামনে ধরল।

রুবি হেসে বলল, "এসব কিছু আমি বাড়ীতে খাইনে, আজ তোর কাছে খাব।"

লতিফা বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে রুবির দিকে তাকিয়ে রইল। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না।

রুবি হেসে বলল, "নে, খা এখন। এ সবের মানে তুই বুঝবিনে। দেখছিস ত আমি থাকি হিন্দু-বিধবাদের মত। একবেলা খাই; তাও আবার নিরামিষ। ঘি খাইনে, চা, পান ত নয়ই। সাদা থান পরি, তেল দিইনে চুলে। এই সব আর কি। এখন বুঝলি ত?"

খেতে খেতে হেসে ফেলে বলল, "যে স্বামীকে ।স্বীকার করল না, তার আবার বৈধব্য ! আমারই ত হাসি পায় সময় সময় !"

লতিফা একটু ক্রুদ্ধ স্বরেই বলে উঠল, ,বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে রুবি ।"

রুবি সে কথার উত্তর না দিয়ে চা খেতে খেতে বলল, "আঃ, এই একটু চা পেলে আমু ভাই কেমন লাফিয়ে উঠত আনন্দে দেখেছিস !"

লতিফা এইবার হাঁফ ছেড়ে বেঁচে ব'লে উঠল, "সত্যি ভাই রুবি, দাদু বোধ হয় তোর চেয়েও চায়ের কাপকে বেশি ভালবাসে !"

রুবি গম্ভীর হবার ভান করে বলে উঠল, "তার কারণ জানিস বুঁচি ? চায়ের কাপটা যত সহজে মুখের কাছে তুলে ধরা যায়, আমায় যদি অমনি করে হাতে পেয়ে মুখের কাছে তুলে ধরে পান করতে পেত তোর দাদু, তা হলে আমিও ঐ চায়ের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে উঠতুম । বলেই হেসে ফেললে ।"

লতিফা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বললে, "ওমা, তুই কি বেহায়াই না হয়েছিস রুবি ! একেবারে গেছিস্ !"

রুবি সায় দিয়ে বলে উঠল, "হাঁ, একেবারেই গেছি আর ফিরব না ।"

চা খাওয়া শেষ হলে রুবি বলে উঠল, "শুধু একজনের জন্য ঐ চা-টার ওপর লোভ হয় !"

রুবির অতিরিক্ত প্রগলভতায় ক্ষুব্ধ হয়ে লতিফা বলে উঠল, "এতই যদি তোর লোভ, তা হলে চা-খোর লোকটাকে বেঁধে রাখলিনে কেন ? তা হলে সেও বাঁচত, তুইও বাঁচতিস, আমরাও বাঁচতাম ।"

রুবি বিনা-দ্বিধায় বলে উঠল, "একটা বললি ভাই বুঁচি! আমরা হয়ত বেঁচে যেতুম সত্যি, কিন্তু তোর দাদু বাঁচত না।"

লতিফা বোকার মত খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, "তার মানে?"

রুবি লতিফার হাতে কটাস ক'রে চিমটি কেটে দিয়ে বলল, "মর নেকি! তাও বুঝলিনে।" তারপর একটু থেমে বলল, "যে মরেনি তার আবার বাঁচা কি! তোর দাদু ত আমার মতন মরেনি। দিব্যি জল-জ্যান্ত বেঁচে থেকে কুলি-মজুর নিয়ে মাঠে-ঘাটে চ'রে খাচ্ছে। আমার একটা বড় দুঃখ রইল ভাই, যার জন্যে মরলুম, তাকে মেরে যেতে পারলুম না।"

লতিফা কতকটা কূল পেয়ে হেসে ফেলে বললে, "বাপরে! কি দস্যি মেয়ে তুই! শোধ না নিয়ে যাবিনে! তা তোকে একটা খোশ খবর দিচ্ছি ভাই। সে হয়তো মরেনি তোর মত, কিন্তু ঘা খেয়েছে।"

রুবি একেবারে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠল, "না, না, এ হ'তেই পারে না! ও শুধু মানুষের বাইরের দুঃখকেই দেখেছে, ভিতরের দুঃখ দেখবার ওর ক্ষমতা নেই, হৃদয় বলে কোনো কিছুরই বালাই নেই ওর! ও শুধু তাদেরই দুঃখ বোঝে, যারা ওর কাছে কেবলি পেতে চায়। যে তাকে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে—চেয়ে নয়, সুখী হতে চায়, তার দুঃখ ও বোঝে না, বোঝে না।

খুলে-পড়া এলোচুলের মাঝে রুবির চোখ আঁধার বনে সাপের মানিকের মত জ্বলতে লাগল।

লতিফার চোখ দুঃখে আনন্দে গর্ব্বে ছলছল ক'রে উঠল। তার দাদুকে এমন ক'রে ভালোবাসবারও কেউ আছে। সে রুবিকে একেবারে

বুকে চেপে ধ'রে শান্তস্বরে বলল, "তোর অভিমানের কুয়াশায় কিছু দেখতে পাচ্ছিসনে রুবি, আমিও ত মেয়েমানুষ। আমি সত্যি বলছি, সে তোকে ভালোবাসে।"

রুবির চোখের বাঁধ ছাপিয়ে জল ঝরতে লাগল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দগ্ধ দুপুরে বর্ষা নামার মত।

লতিফা তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "আমার দুঃখ হচ্ছে রুবি, ভালবাসার এই অতলতার সন্ধান পেলে তার কারাবাসও বেহেশতের চেয়ে মধুর হয়ে উঠত। তুই ভালোবাসিস শুধু এইটুকুই সে জানে। তার তল যে এত গভীর, তা বোধ হয় জানে না।" ব'লেই রুবির গাল টিপে হেসে বলল, "জানলে দেশসেবা ছেড়ে দিয়ে কোন দিন তোর পদসেবা সুরু করত।"

রুবি কিন্তু এর পরে একটি কথাও কইল না। অতল পাথারের ঝিনুক যেমন দিনের পর দিন ভেসে বেড়ায়, ঢেউ-এ ঢেউ-এ, একবিন্দু শিশিরের আশায়, স্বাতী নক্ষত্রের শিশিরের আশায়, তারপর সেই শিশিরটুকু বুকে পেয়েই সে জলের অতল তলে ডুবে যায় মুক্তা ফলাবার সাধনায়—এ-ও তেমনি।

"সেও ভালোবাসে" শুধু এইটুকু সান্ত্বনাতেই যেন রুবির বুক ভ'রে উঠল। শুধু এই একবিন্দু শিশিরের প্রতীক্ষাতেই যেন সে তার তৃষ্ণার্ত মুখ তুলে অনির্দ্দেশ শূন্যের পানে তাকিয়ে ছিল। তার বুক ভ'রে উঠেছে। তার মুখের বাণী মূক হয়ে গেছে। সে আর কিছু চায় না। এইবার সে মুক্তা ফলাবে। সে অতল তলে ডু'বে গেল।

ঝিনুকের মুখে একবিন্দু শিশির! নারীর বুকে একবিন্দু প্রেম!

আকাশের এক কোণে এক ফালি চাঁদ। কোন্ মাসের চাঁদ জানে না, তবু রুবির মনে হতে লাগল, ও যেন ঈদের চাঁদ! ওর রোজার মাস বুঝি শেষ হ'ল আজ।

আকাশের কোলে একটুকু চাঁদ, শিশু শশী। ও যেন আকাশের খুকী। সাদা মেঘের তোয়ালে জড়িয়ে আকাশ-মাতা যেন ওকে কোলে ক'রে আঙিনায় দাঁড়িয়েছে।

অমনি খুকী...

লজ্জায় রুবির মুখ 'রুবি'র মতই লাল হয়ে উঠল। এ কি স্বপ্ন! এ কি সুখ!

বরিশাল। বাংলার জিনিস।

আঁকাবাঁকা লাল রাস্তা। শহরটিকে জড়িয়ে ধ'রে আছে ভুজ-বন্ধের মত ক'রে।

রাস্তার দু-ধারে ঝাউগাছের সারি। তারই পাশে নদী। টলমল টলমল করছে—বোম্বাই-শাড়ী পরা ভরা-যৌবন-বধূর পথচলার মত। যত না চলে, অঙ্গ দোলে তার চেয়ে অনেক বেশি।

নদীর ওপারে ধানের ক্ষেত। তারও ওপারে নারিকেল-সুপারি কুঞ্জ-ঘেরা সবুজ গ্রাম, শান্ত নিশ্চুপ। সবুজ শাড়ী-পরা বাসর-ঘরের ভয়-পাওয়া ছোট্ট ক'নে বৌটির মত।

এক আকাশ হ'তে আর-আকাশে কার অনুনয় সঞ্চরণ ক'রে ফিরছে, "বৌ কথা কও। বৌ কথা কও।"

আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে তখনো রাত্রি অভিসারে বেরোয়নি। তখনো বুঝি তার সান্ধ্য প্রসাধন শেষ হয়নি। শঙ্কায় হাতের আলতার শিশি সাঁঝের আকাশে গড়িয়ে পড়েছে। পায়ের চেয়ে আকাশটাই রেঙে উঠেছে বেশি। মেঘের কালো খোঁপায় তৃতীয়া চাঁদের গো'ড়ে মালাটা জড়াতে গিয়ে বেঁকে গেছে। উঠোনময় তারার ফুল ছড়ানো।

তিন-চারটি বাঙালী মেয়ে, কালোপেড়ে শাড়ী পরা, বাঁকা সিঁথি,

হিল্-ও' পায়ে দেওয়া,—ঐ রাস্তারই একটা ভগ্নপ্রায় পুলের উপর এসে বসল! মাথার ওপর ঝাউ শাখাগুলো প্রাণপণে বীজন করতে লাগল।

মাঝে মাঝে স্থানীয় জমিদারদের দু-একটি মোটর ফিটন যেতে যেতে মেয়েগুলির কাছে এসে গতি শ্লথ ক'রে আবার চ'লে যেতে লাগল। একটি মেয়ে ছাড়া আর সকলে মশগুল হয়ে গল্প জুড়ে দিল। একটা-মেয়ে একটু দূরে নেমে ঘাসের ওপর ব'সে এক দৃষ্টে নদীর দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল, জিজ্ঞাসা করলে হয়ত সে নিজেই বলতে পারত না।

অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর দলের একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "মেজ-বৌ, ওখানে একলাটি ব'সে কার কথা ভাবছ ভাই?"

মেজ-বৌ উত্তর দিল না।

মেয়েটি তখন উঠে গিয়ে তাকে একটু জোর ক'রেই নিজেদের কাছে এনে বসিয়ে হেসে বললে, "জান, মেম সায়েবের হুকুম তোমাকে চোখে চোখে রাখার। সরে পড়ো না যেন ভাই, তা হলেই গেছি!"

মেজ-বৌ ম্লান হাসি হেসে বললে, "না, সে ভয় নেই। আর স'রে পড়লেও ত ঐ নদীর জল ছাড়িয়ে বেশি দূর যাব না।"

অস্তমান তৃতীয়া চাঁদের মুখ ম্লান হয়ে উঠল তার হাসিতে। ঝাউগাছগুলো জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

যে মেয়েটি কথা বলছিল, তার নাম মিনতি।

মেজ-বৌর প্রায় সমবয়সী। হিন্দুঘরের বৌ ছিল সে। স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে খ্রীস্টান হয়ে ডাইভোর্স নিয়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে।

লেখাপড়া-জানা মেয়েদের শিক্ষয়িত্রীরও কাজ করে।

এই মেয়েটিই মেজ-বৌর একমাত্র বন্ধু। চোখের জল বদল করা সই।

অন্য দু'টি মেয়ের একজন ব'লে উঠল. "আচ্ছা ভাই, ওর মেজ-বৌ নাম কি আর ঘুচবে না?"

মেজ-বৌ হেসে বললে, "তালগাছ না থাকলেও তালপুকুর নামটা কি বদলে যায়?"

তেমনি জোর-করা হাসি! বুকের সলতে জ্বালিয়ে প্রদীপের আলো দেওয়ার মত।

মিনতি মেজ-বৌকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ব'লে উঠল, "তা ভাই, ওকে ঐ নামে ডাকতেই ত বেশ মিষ্টি লাগে। মনে হয় বেশ ঘর-সংসার ক'রে জা-ননদ মিলে সব আছি!"

অন্য মেয়েটি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুর ক'রে গেয়ে উঠল, "হায় গৃহ-হীন, হায় গতিহারা।" তারপর কথায় একটু নুন-লঙ্কা মিশিয়ে বললে, "তা ভাই, তোমাদের ঘরের সাধ এখনো মেটেনি! তা দুধ খাওয়ার সাধই যদি জেগে থাকে, এ ঘোল খেয়ে খামকা সর্দ্দি করছ কেন?"

মেজ-বৌ ঝালকুটু সয়ে নিয়ে বলল, "তা ভাই, মাথায় ঘোল ঢালার চেয়ে পেটে ঘোল ঢালা বরং সইবে।"

মেয়েটির গোপন দুর্ব্বলতায় ঘা দিল গিয়ে এই ওস্তাদী মারটুকু। সে মুখ বেঁকিয়ে ব'লে উঠল, "মেজ-বৌ ও কথা শিখেছে দেখছি!"

মেজ-বৌ হেসে বললে, "তারচেয়ে বল মানুষ হয়ে উঠলাম। আমরা

কৃষ্ণনগরের মেয়ে ভাই, আমাদের কথা শিখতে হয় না! মায়ের পেট থেকেই কথা শিখে আসে আমাদের দেশের মেয়ে! কিন্তু তুমি রেগো না ভাই, আমি সত্যিই তোমাদের সঙ্গে মিশতে পারবার মত হইনি। এই ত জোর ক'রে ফ্যাশন করে শাড়ী পরাচ্ছ, বাঁকা সিঁথি কেটে দিচ্ছ, জুতোও মিলল কপালে, কিন্তু ও জুতো শাড়ী দিয়েও কি তোমাদের মত ক'রে তুলতে পারলে। মেমসায়েবদের জুতো মেম-সায়েবদের মাথায় থাক ভাই, আমি সাদা কাপড় প'রে থাকতে পারলেই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি!"

মেয়েটি একটু তীক্ষ্ণ স্বরে ব'লে উঠল, "তা হ'লে এখানে এলে কেন?" তার এই খাপছাড়া প্রশ্নে সে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে উঠল এবং সেই কারণেই ততোধিক রেগে গেল।

মেজ-বৌ তেমনি হাসিমুখে বলল, "আমি ত মেমসায়েব হ'তে আসিনি ভাই, মানুষ হ'তে এসেছিলুম। আলো-বাতাস প্রাণের বড্ড অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখীর মত শিকলি কেটে বেরিয়ে পড়েছিলুম। কিছু যে ভাল হয়নি আমার, তা বলব না। এখন যা শিখেছি, তাতে ক'রে যেখানেই থাকি দুটো পেটের ভাত যোগাড় করবার অসুবিধে হবে না। কিন্তু কি করি, চিরজন্মের অভ্যেস, ঐ জুতোটুতোগুলো পরলে মনে হয় পায়ে এ এক নতুন রকমের শিকলি পড়ল!"

মিনতি উঠে পড়ে বলল, "আচ্ছা, এইবার থেকে তুমি লুঙ্গি প'রে থেকো, আমি ব'লে দেব গিয়ে! জুতোটুতো তোমার পোড়া কপালে সইবে না! এখন চল, রাত্তির হয়ে যাচ্ছে।"

সকলে উঠে পড়ল।...

একটু না যেতেই প্যাঁকালের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে পাদরী সাহেবের সুপারিশের জোরে এখানে এসেই ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের পিওনের পদ লাভ করেছে! এখন আর সে প্যাঁকালে নয়, তার নাম এখন জোসেফ। ম্যাজিস্ট্রেট ডাকে, "জোসেফ!" আনন্দে প্যাঁকালে প্রায় কেঁদে ফেলে! "হুজুর" ব'লে পড়ি কি মরি ব'লে ছুটে এসে আড়াই হাত লম্বা এক কুর্নিশ ঠোকে। শ্রীমতী কুর্শি ওরফে মিসেস প্যাঁকালে মিশনারী মেমদের ফাই-ফরমাশ খেটে দেয়, তার জন্য কুড়ি টাকা করে পায়। প্যাঁকালের পনের আর কুর্শির কুড়ি, মোট পঁয়ত্রিশ। দিব্যি হেসে খেলে সংসার চলে। কুর্শি প্যাঁকালেকে বড় একটা কেয়ার করে না, সে পাঁচ টাকা বেশ রোজগার করে। প্যাঁকালে কিছু বললে, বলে, "আমি তোর খাই নাকি রে মিনসে? বেশি টকখাই টকখাই করিসনে।" বলে গরব ক'রে চলে যায়।

প্যাঁকালে না খেয়েই আফিসে চ'লে যেতে চায়। বলে, "আমি ম্যাজিষ্টারের পিয়ন। তোর মতন কত বিশ টাকা আমার কাছার তলায় ঝোলে। তোর মেমসায়েবকে শুধোয় কে!"

ঘরের বাইরে পা দিতেই কুর্শি কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে বলে, "যা দিকিন্ দেখি!" বলেই খপ্ করে কোঁচাটা ধরে ফেলে। বলে, "আর এক পা এগুবি ত কেলেঙ্কারী বাধিয়ে দেবো। কাপড় কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবো!" বলেই কোঁচায় হেঁচকা টান দেয়।

প্যাঁকালে অসহায় অবস্থায় সেখানে ব'সে পড়ে বলে, "ছেড়ে দে বলছি শালি! নইলে দিলুম ধুমাধুম!... হেই কুর্শি, তোর পায়ে

পড়ি! কেউ দেখতে পাবে এখুনি! আল্লার কিরে! যীশু খ্রীষ্টের কিরে! মাইরি বলছি, আর কখখনো কিছু বলব না!" বলেই নাকে কানে হাতে দেয়।

কুর্শি কোঁচা ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বসে পড়ে। বলে, "চল্, খাবি! খেয়ে তোর ম্যাজিষ্টর খসমের কাছে গিয়ে রাগ দেখাস!"

বার-আনা দিগম্বর প্যাঁকালে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! তারপর খেয়ে-দেয়ে গুড়গুড় করে আফিসে যায়। যাবার সময় বলে যায়, শালার মেয়ে-মানুষকে বিয়ে করার মতন গুখুরী কাজ আর নাই! তোকে যদি আর কখনো বিয়ে করি, আমার বাপের—"

কুর্শি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, "আসতে যদি পাঁচ মিনিট দেরি করবি, তা হ'লে আজ মেমসায়েবদের কাছে গিয়ে শুয়ে থাকব!"

সেদিন রাস্তায় মেজ-বৌকে দেখে পূর্ব্ব অভ্যাস মত বলে উঠল, মেজো ভাবি, তোমাকেই খুঁজছি আমি।"

মেজ-বৌ হেসে বললে, "কেন, কুর্শি কি আজও তাড়িয়ে দিয়েছে? আচ্ছা কুকুরে-ভালবাসা তোমাদের যা-হোক!" বলেই পুরানো দিনের মত মিষ্টি করে হাসে। অন্ধকার মেঘে বিজলীর ক্ষণিক ছটা!

ঐ হাসির মানে আগে প্যাঁকালে বুঝত না। কিন্তু এখন সে মানুষ হয়ে না গেলেও ডাঁশিয়ে উঠেছে, কাজেই ও হাসিতে বেশ একটু যেন চমকে ওঠে। আঁধার রাতে বিজলী আর সাপ দুটোই চমকে দেয়।

প্যাঁকালে একটু থেমে তার পাশের মেয়েগুলোর দিকে আধাকটাক্ষে চেয়ে নিয়ে বললে, "বাড়ীর থেকে একটা চিঠি এসেছে, বিকেলে তুমি যদি একটু পড়ে দিয়ে আস।"

মেজ-বৌকে কে যেন হঠাৎ চাবুক মারলে, চম্‌কে উঠল সে! মুখ কেমন হয়ে গেল, আবছা আঁধারে ভালো দেখা গেল না। কিন্তু গলার স্বর শুনে মনে হ'ল, কে যেন তার টুঁটি টিপে ধরেছে!

মেজ-বৌ শক্ত মেয়ে। তবু সে আজ আর সামলাতে পারল না! কম্পিত দীর্ঘ কণ্ঠে বলে উঠল, "চল এখনি তোমার বাড়ী চল।"

প্যাঁকালে বলতে যাচ্ছিল, "আজ আর না-ই গেলে, কাল—"

বলল, "না, না, এখ্‌খনি চল!" বলেই সে প্রায়-ছুটে প্যাঁকালের বাড়ীর দিকে চলতে লাগল। তার সঙ্গে যে আর কেউ ছিল, বা তাদের কোন কিছু বলবার দরকার, সে সব ভাববারও যেন অবসর ছিল না তার।

মিনতি প্যাঁকালেকে বলে দিল, সে যেন মেজ বৌর চিঠি পড়া হলেই তাকে সঙ্গে ক'রে রেখে দিয়ে যায়।

দূরে থেকে দেখা গেল, মেজ-বৌ তেমনি বেগে ছুটেছে ঘরের পথে।

হাউই যেমন বেগে আকাশে ওঠে, তেমনি বেগেই মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে!

মেজ-বৌ ঝড়ের মত প্যাকালের ঘরে এসে ডেকে উঠল, "কুর্শি !"

মেজ-বৌর এমনতর স্বর কুর্শি কখনো শুনে নাই। সে ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই মেজ-বৌ বললে, "কি চিঠি এসেছে দেখি !"

কুর্শি নিঃশব্দে চিঠি এনে দিল। তারও তখন পা কাঁপছে। তারা আসা অবধি এই এক বছরের মধ্যে কারুর কোন চিঠি পায়নি। হঠাৎ আজ বীয়ারিং চিঠি দেখে সকলেই মনে করছিল, না জানি কার কোন দুঃসংবাদ আছে এতে।

মেজ-বৌ হেরিকেনের কাছে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিঠি খুলে খানিকটা পড়েই একেবারে মাটিতে পড়ে চীৎকার ক'রে উঠল, "খোকা ! খোকা ! বাপ আমার !"

ততক্ষণে প্যাকালে এসে পড়েছিল। সে আসতেই মেজ-বৌ একেবারে তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে বলে উঠল, "আমার খোকা বুঝি আর বাঁচে না ভাই ! সে তার এই পোড়াকপালী মাকে দেখতে চায়। আমায় নিয়ে চল, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমায় নিয়ে চল।" ব'লেই সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল।

প্যাকালে, কুর্শি বহু কষ্টে মূর্চ্ছা ভাঙালে।

আজ এক বৎসর বরিশাল এসেছে ওরা। এর মধ্যে কেউ কোনো চিঠি দেয়নি। মেজ-বৌ কিসের যেন আতঙ্কে কৃষ্ণনগরের নাম পর্য্যন্ত শুনলে পালিয়ে যেত। তার কেবলি মনে হ'ত, এই বুঝি তার খোকা-খুকীর অসুখের খবর এসে পড়ল। সে দিনরাত প্রার্থনা করত, ওরা ভাল থাক, বেঁচে থাক, কিন্তু কোনো চিঠি যেন কোনো দিন না আসে। কিন্তু সোয়াস্তিও ছিল না তার, সে ঘুমে-জাগরণে—সব সময় যেন তার ক্ষুধাতুর শিশুদের কান্না শুনতে পেত। সে রাক্ষুসী! ইচ্ছা ক'রেই ছেলেমেয়েদের ফেলে এসেছিল। চ'লে আসার দিন তাকে যেন ভূতে পেয়েছিল! তাকে এদেশ ছেড়ে যেতে হবে, শুধু এই কথাই তার মনে হয়েছিল। সে যে মা, সে কথা সেদিন সে ভুলে গিয়েছিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মেজ-বৌ আবার সমস্ত চিঠিটা পড়ল। প্যাঁকালের মা চিঠি লিখছে—লিখছে মানে কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। খোকার অর্থাৎ মেজ-বৌর ছেলের ভয়ানক অসুখ, টাইফয়েড। বোধ হয় বাঁচবে না। যে ছেলে এক বছর ধ'রে ভুলেও তার মায়ের নাম মুখে আনেনি, সে আজ বিকারের ঘোরে কেবলি বলছে, "আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল্!" প্যাঁকালের মাও মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু মরবার আগে সে যেন যার ছেলে তার হাতেই দিয়ে যেতে পারে। ছেলের কান্না শুনে গাছের পাতা ঝ'রে পড়ে, আর ওর রাক্ষুসী মা'র মন গলবে না!

* * * *

সেইদিন রাত্রেই মেজ-বৌ, প্যাঁকালে, কুর্শি কৃষ্ণনগর যাত্রা করল। যাবার আদেশ পেতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়

মিশনারী কর্ত্তারা মেজ-বৌকে ভাল ক'রেই চিনতেন। কাজেই তাঁরা আপত্তি করলেও যাওয়া বন্ধ করতে সাহস করলেন না।

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ়তর হয়ে আসছে, সেই সময় তারা কৃষ্ণনগর স্টেশনে এসে পৌঁছল। এই একটা বছরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তনই না হয়ে গেছে এর। মেজ-বৌর শোকাচ্ছন্ন চোখের মলিন দৃষ্টির ম্লানিমা লেগে ষ্টেশনের কয়লা-রঞ্জিত পথ যেন আরো কালো হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, কে যেন তার স্থূল হাতের কর্কশ পরশ বুলিয়ে সেই পূর্ব্বের কৃষ্ণনগরের সব সৌন্দর্য্য মুছে নিয়ে গেছে।

একটা ছ্যাকড়া গাড়ীতে উঠেই মেজ-বৌ বললে, "খুব জোরে হাঁকাও।" এতক্ষণ এত দূর পথে আসতে যে হৃৎস্পন্দনের চঞ্চলতা তাকে অধীর ক'রে তোলেনি, স্টেশনে নেমেই তার সেই চঞ্চলতা যেন শতগুণে বেড়ে উঠল। একবার মনে হ'ল, এ রাস্তার যেন শেষ না হয়। এই গাড়ী যেন এইরকম ক'রে অনন্তকাল ধরে ছুটতে থাকে।...হয়ত এতক্ষণে তার খোকার মুখে 'মা' ডাক নিঃশেষিত হয়ে গেছে!

কোচয়ানের চাবুক খেয়ে ঘৃতপক্ক অশ্বিনী-কুমারদ্বয় যেটুকু স্পিড্ বাড়ালে, তাকে ঘোড়া-দৌড় ঠিক বলা চলে না, সে কতকটা খোঁড়া-দৌড়! তাতে যেমনি হাসি পায়, তেমনি অসহায় জীবগুলির প্রতি করুণায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু ঘোড়ার চেয়েও আর্ত্তনাদ করতে লাগল গাড়ীর চাকাগুলো। তারা যেন আর গড়াতে পারে না। পথের বুকে মুখ ঘসে ঘসে যেন তাদের প্রতিবাদ-ক্রন্দন জানাতে থাকে। রাস্তাও তেমনি। যেন দাঁত বের করে মিউনিসিপ্যালিটিকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে!

টিকুতে টিকুতে গাড়ী এসে প্যাকালেদের বাড়ীর দোরে লাগল।

ভিতর থেকে কোনো শব্দ শোনা গেল না। ভিতরে কেউ আছে ব'লেও মনে হ'ল না। একটা মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণ শিখার আশ্বাসও নেই সেখানে।

মেজ-বৌর বুক অজানা আশঙ্কায় হা হা করে উঠল! তার অন্তরে যেন অনন্ত আকাশের শূন্যতায় রিক্ত আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। সে টলতে টলতে গাড়ী থেকে নেমে দোরের গোড়ায় আছড়ে পড়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, "খোকা!"

কে যেন তার টুঁটি চেপে ধরেছে।

শূন্য ঘরের বুক থেকে কার যেন ক্ষীণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল! ও আর্ত্তনাদ যেন এ পারের নয়, সাঁতরে পার-হওয়া নদীর-পারের শ্রান্ত যাত্রীর।

প্যাঁকালে ততক্ষণে বন্ধ ঘরের আগোড় খুলে ঢুকে পড়েছে। তার পায়ে কঙ্কালের মত কি একটা ঠেকতেই সে চীৎকার ক'রে উঠল, "মা! মা!"

হঠাৎ রান্নাঘরের দোর খুলে গেল; এবং তার ভিতর থেকে বড়-বৌ বেরিয়ে এসে ভয়াতুর শীর্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "কে?"

মেজ-বৌর মূর্চ্ছাতুর কণ্ঠে আর একবার শুধু একটু অস্পষ্ট অনুনয় ধ্বনিত হ'ল, "খোকা, আমার খোকা কই?"

বড়-বৌ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, "রাক্ষুসী, এতদিনে এলি! খোকা নেই! কাল সকালে সে চলে গেছে!"

মেজ-বৌ "খোকা" ব'লেই আহত বিহগীর মত সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল!...

প্যাকালে আর্ত্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "বড়-বৌ, কি ভীষণ অন্ধকার! আর সহ্য করতে পারছিনে, বাতি, বাতি কই?"

বড়-বৌ তেমনি কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠল, "বাতি নেই! সব বাতি নিবে গেছে! ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই।"

প্যাকালে উন্মাদের মত ভাঙা ঘরের চালা থেকে একরাশ পচা খড় টেনে জ্বালিয়ে দিয়ে ব'লে উঠল, "তা হ'লে ঘরই পুড়ুক!"

সেই রক্ত-আলোকে দেখা গেল, প্যাকালের মা তার কঙ্কাল আর আবরণ চামড়াটুকু নিয়ে তখনো ধুঁকছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

প্যাকালে "মা" ব'লে তার বুকে পড়তেই বৃদ্ধার চক্ষু একটু জ্বলে উঠেই পরক্ষণে নিবে গেল চিরকালের জন্য!

চালের খড় তখনো ধু ধু ক'রে জ্বলছে। ওদেরি বুকের আগুনের মত। একটু পরে সে অগ্নিশিখাও যেন অতি শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

(২৬)

পাড়ার লোক মেজ-বৌকে দেখলেই বলে, "ও রাক্ষুসী! ওর বুকে শুধু লোহা আর পাথর!"

খোকা চ'লে গেছে। মেয়ে পটলিকে নিয়েই মেজ-বৌ আবার আগের মত পান খেয়ে রেশমী চুড়ি প'রে বাঁকা সিঁথি কেটে চওড়া কালো পেড়ে শাড়ী প'রে পাড়া বেড়ায়।

মাত্র মাস খানেক হ'ল ছেলে মরেছে!

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরই মেজ-বৌ উন্মাদিনীর মত তার ছেলের যা-কিছু স্মৃতিচিহ্ন যেখানে ছিল, মায় শতছিন্ন কাঁথাটি পর্য্যন্ত,—সব পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিয়েছে! এই এক বছর ধরে গোপনে সে যে সব খেলনা সঞ্চয় ক'রে রেখেছিল, তাও ঐ সঙ্গে পুড়িয়েছে।

তার হৃদয়ের সমস্ত শোক-জ্বালাকেও যেন ঐ দিনই চিরদিনের মত ভস্মীভূত ক'রে দিয়েছে। তারপরে নিজেই সে আগুন নিবিয়েছে, কলসী কলসী চোখের জল ঢেলে! আজ যেন তার আর কোনো শোক নেই, কোনও দুঃখ গ্লানি নেই। চোখের জলও যেন ঐ সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে!

এ যেন তার আর এক জন্ম! সে যেন নব জন্মের নতুন লোকের নতুন মানুষ।

মেয়ে পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়, তার যত্ন নেয় না। ও যেন ওর মেয়েই নয়। কেউ বলে, শোকে পাগল হয়েছে, কেউ বলে—রসের পাগল!

ঐ ঘরেই সে থাকে, মিশনারীর সাহেব-মেমদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে সেখানে যায়নি, কিন্তু আবার তেমনি ক'রে মুসলমানও হয়নি।

প্যাকালেকে স্থানীয় খান বাহাদুর সাহেব একটা কুড়ি টাকার চাকুরি জুটিয়ে দেওয়াতে—সে আবার কল্‌মা প'ড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। কুর্শির বাবা মধু ঘরামী অনেকদিন আগেই মারা গেছে। কাজেই কুর্শিও খানিক কেঁদে কেটে শেষে প্যাকালের ধর্ম্মকেই গ্রহণ করেছে। সুতরাং ওদের দিন বেশ একরকম চলে যাচ্ছে।

শুধু মেজ-বৌ যেন ঘরে থেকেও ঘরের নয়। এর ওর বাড়ী যায়—এবং যায় একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই [illegible]-দোরস্ত হয়ে। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকে তাকে একখানা চৌকি এগিয়ে দেয়। তাদের [illegible], মেজ-বৌ এই এক বছরে না জানি বহু সাহেব-কাপ্তেন পাকড়ে টাকার কুমীর হয়ে এসেছে! দুঃখ ধান্দা ক'রে খায়, কাজেই আগে থেকে একটু মুখের ভাবটা থাকলেও হয়ত বা কালে-কবুলে হাত পাতলে কোন্ না দুটো টাকা পাওয়া যাবে!

সত্যিসত্যিই মেজ-বৌ কিছু টাকা জমিয়েছিল, কিন্তু সে দু-এক শ মাত্র, তার বেশি নয়। তাই সে বিবিয়ানি ক'রে উড়াচ্ছে, এর পর কি হবে বা কি করে চলবে, সে চিন্তাও যেন সে করে না।

তার টাকার লোভে বাড়ীর লোকেও কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

পাড়ার মোড়ল হিসেবি লোক, অনেক চিন্তার পর সে স্থির করলে যে, পাড়ার কোনো মুসলমান ছোকরাকে দিয়ে ওর রসস্থ মন ভুলাতে পারলে ওকে অনায়াসেই স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে একজন নাসারাকে মুসলিম করার গৌরব ও পুণ্যের অধিকারী হ'তে পারবে। কাজেই সে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না এ নিয়ে। কি জানি, যদিই বেশি টানে দড়ি ছিঁড়ে যায়!

কেউ কিছু বললে মোড়ল হেসে বলে, "বাবা, এখন দিগ্‌দড়ি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। যাবে কোথা? একটু চ'রে থাক, তারপর ঘরের গাই ঘরে ফিরে আসবে!"

মোড়লের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে তারা ফিরে যায়।

মেজ-বৌ লতিফার কাছেই যায় সব চেয়ে বেশি ক'রে। লতিফা যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ, তাতে ক'রে সে চিরকাল হৃদয়টাকেই বড় ক'রে দেখতে শিখেছে। মেজ-বৌর ভিতরে যে আগুন সে দেখেছিল, তাকেই সে শ্রদ্ধা করে। কাজেই তাকে স্বধর্মে ফেরানো নিয়ে কোনদিনই পীড়াপীড়ি করেনি। নাজির সাহেব বেচারা একেবারে যাকে বলে মাটির মানুষ। এ নিয়ে ওঁর কোনো মাথা ব্যথাই নেই। শুধু লতিফাকে রহস্যের ছলে এ নিয়ে একটু চিমটি কাটেন মাত্র। বলেন, "দেখো গো, শেষে তুমিও যেন আড়কাঠির পাল্লায় প'ড়ে আমায় অকূলে না ভাসাও!"

লতিফা হেসে বলে, "তুমি ত ভাসবার মত হালকা নও, তোমার বরং ডুববারই বেশি ভয়! তা সে দিক দিয়ে ভয় আমারই বেশি! আমিই ত খাল কেটে বেনোজল আর কুমীর দুই-ই ঘরে আনছি!"

নাজির সাহেব নিজের দেহের দিকে তাকিয়েকৃত্রিম দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে বলেন, "নাঃ! ডুববার মতই বপুটা স্থূল হচ্ছে বটে! এইবার থেকে রাত্তিরে উপোস দিয়ে এ বরবপু একটু হালকা করতে হবে—অন্তত ভেসে যাবার মত!"

লতিফা নাজির সাহেবের গায়ে খুতকুড়ি দিয়ে কটাস ক'রে রাম-চিমটি কেটে বলে, "ষাট! বালাই! তোমায় কে মোটা বলে! তার চোখে ভ্যালার আঠা দিয়ে দেবো!"

নাজির সাহেব "উহু উহু" ক'রে ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে বলেন, "বাপ রে বাপ! আগে জানলে কে এ স্পূর্ণনখাকে বিয়ে করত!...

সেদিন সকালে উঠেই মেজ-বৌ হঠাৎ ব'লে উঠল, "বড়-বু! আমি আজ পাড়ার সমস্ত ছেলেদের খাওয়াব!"

বড়-বৌ বুঝতে না পেরে বললে, "কেন?"

মেজ-বৌ সহজ কণ্ঠেই বললে, "আজ খোকার চালশে।"

বড়-বৌর দুই চোখ জলে ভ'রে উঠল। সত্যিই ত আজ চল্লিশ দিন হ'ল খোকা চ'লে গেছে! মেজ-বৌ তা হ'লে ভোলেনি। ভুলবার ভান্ করে মাত্র। বড়-বৌ চোখের জল মুছে ব'লে উঠল, "তা তোর ছেলের নামে খাওয়াবি, ওতে আমাদের কি বলবার আছে ভাই। কিন্তু একবার পাড়ার মোড়ল আর মৌলবী সায়েবকে ত বলতে হয়!"

মেজ-বৌ তেমনি শান্ত কণ্ঠে বললে, "না, ওদের কাউকে বলব না। শুধু ছোট ছোট খোকাদের ডেকে নিজে রেঁধে খাওয়াব!"

বড়-বৌ কেঁদে ফেলে বললে, "ওরে পাগলী! মোড়ল না বললে, কেউ যে তার ছেলেকে তোর হাতের রান্না খেতে দেবে না!"

মেজ-বৌ একটু থেমে ব'লে উঠল, "ও: আমি যে খৃষ্টাননি! তা যে ক'রেই হোক, আমি খাওয়াবই!" ব'লেই সে কিছু না ব'লে মোড়লের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল।

মোড়ল দেখলে, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সুযোগ। এ সুযোগ ছাড়লে তবে আর ঘরে ফেরানো যাবে না। সে খুব ভালমানুষ সেজে বললে, "তা কি করব বল্ মা, তুই ত আমার মেয়ের মতই! খৃষ্টানের হাতে আমি বললেও কেউ খাবে না। ম'রে গেলেও না!"

মেজ-বৌর দগ্ধ চোখে সহসা যেন অশ্রুর পুঞ্জীভূত মেঘ ঘনিয়ে এল। তার মনে পড়ল কতদিন অনাহারে কাটিয়ে তার খোকা চ'লে গেছে! তার সমস্ত মন যেন হাহাকার ক'রে আর্তনাদ ক'রে উঠল। সে আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না! ডুকরে কেঁদে উঠে সামনের উঠানে লুটিয়ে প'ড়ে বলতে লাগল, "আমি আজই মুসলমান হব। আমায় খোকার আত্মা যেন চিরকালের ক্ষুধা নিয়ে না ফিরে যায়!"

মোড়ল যেন হাতে চাঁদ পেল! সে তখনি উঠে মেজ-বৌকে তুলে বলল, "এই ত মা, এতদিনে মানুষের মত, মায়ের মত কথা বললি! তোর খোকা মরবার সময় পর্য্যন্ত বিকারের ঘোরে বলেছে, "মা, তুই খেরেস্তান তোর হাতের পানি খাব না।" তুই মুসলমান হয়ে ওর ফাতেহা না দিলে ওর শান্তি হবে।"

মেজ-বৌ দুই কানে আঙুল দিয়ে ব'লে উঠল, "আর ওর নাম করো না আমার কাছে। ওর কোনো কথা ব'লো না। আজ পাড়ার সব ছেলেই আমার খোকা।"

মোড়ল মাথায় হাত দিয়ে বললে, "তাই হোক। ওরাই তোর খোকা হোক। ওদের খাইয়ে, কোলে করে তুই তোর খোকার শোক ভোল।"

মেজ-বৌ চ'লে গেলে মোড়ল আপন মনেই ব'লে উঠল, রাক্ষুসী হ'লেও মা ত। নাড়ীর টান, যাবে কোথায় ?"

পাড়ার প্রায় শতাধিক ক্ষুধাতুর শিশুদের পরিপাটি ক'রে মেজ-বৌ খাইয়ে দাইয়ে বিদায় ক'রে যখন লতিফার বাড়ী এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে রুবির প্রকাণ্ড মোটরকার দাঁড়িয়ে।

কি যেন এক নিবিড় প্রশান্তিতে আজ মেজ-বৌর বুক ভরে উঠেছে। ঐ সব ক্ষুধাতুর শিশুদের খাওয়াতে খাওয়াতে, তাদের প্রত্যেককে আদর করতে কোলে করতে করতে তার মনে হচ্ছিল, তার খোকা হারায়নি! সে এই ক্ষুধাতুর শিশুদের মাঝেই শত শিশুর রূপ ধরে এসেছে। তাদের আদর ক'রে চুমু খেয়ে বুকে চেপে তার সাধ যেন আর মিটতে চায় না! যে খোকাকে দেখে, তার মুখেই সে তার খোকার মুখ দেখতে পায়! আজ যেন সে জগজ্জননী।

সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'ল, ও তারা নয়, ওর খোকা! ঐ দূরলোকে থেকে তার মাকে ফিরে পেয়ে হাসছে! ঐ আকাশের মত বিরাট উদার খোকার মায়ের কোল।

এক আকাশ-মাতার কোলে শত সহস্র তারা—খোকা-খুকী।

সন্ধ্যাতারার পাশেই চতুর্থী তিথির চাঁদ। ও যেন খোকার বাঁকা হাসি! ও যেন খোকার ডিঙি। খোকা বাণিজ্যে বেরিয়েছে—তার মাকে রাজরাণী করবার দুঃসাহসে মণিমাণিক্য আনতে শূন্যে পাড়ি

দিয়েছে! না, না—ও যেন খোকার হাতের ছেদি-দা! দুষ্টু ছেলে দা হাতে গহন বনে পালিয়েছে, তার দুঃখিনী মায়ের জন্যে কাঠ কেটে আনবে! না, না—ও ওর মায়ের জন্যে ঐ শূন্যে ঘর তুলছে মেঘের ছাউনি দিয়ে! আকাশে আকাশে সারাদিন খেলা ক'রে ফিরবে, পালিয়ে বেড়াবে, তারপর সন্ধ্যাবেলায় ঐখানটিতে ঐ উঠোনে দাঁড়িয়ে বলবে, আমি এসেছি, আমি হারিয়ে যাইনি!

মেজ-বৌর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠতেই তার মনে হ'ল ঐ তারার চোখও যেন ঝিকমিক ক'রে উঠেছে! খোকার চোখে জল! না না, আর কাঁদবে না সে! ও যে সকল দেশের সকল লোকের সকল মায়ের খোকা সে! ও কি কারুর একলার? এক মার কাছে এসেছিল, আদর পায়নি, আর এক মা'র কাছে চ'লে গেছে! তবু ত সে আছে! ঐ তারায়, ঐ চাঁদে, ঐ আকাশের কোথাও না কোথাও সে আছেই আছে! যেখানে খুঁজি, সেইখানেই যে ওকে দেখতে পাই! দুষ্টু ছেলে, কখনো ভিখারিণীর কোলে খিদের ছল ক'রে কাঁদে, কখনো পিতৃমাতৃহীনের ছল ক'রে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে বেড়ায়, কখনো মারহাট্টা মায়ের ওপর রাগ ক'রে পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে, কখনো দুলালী মায়ের কোলে সোনাদানা প'রে হাসে! ও কি খোকা, ও যে সর্ব্বগ্রাসী, রাক্ষস। সমস্ত বিশ্বকে যে ও ওর রূপ দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে।....

মেজ-বৌর এত রূপ বুঝি কেউ কখনো দেখেনি। লতিফা রুবি একসঙ্গে চমকে উঠল! এ ত মানুষ নয়! ··মেজ-বৌর চোখে তখন বিশ্বমাতার পরিপূর্ণ দীপ্তি!

মেজ-বৌ হাসতে হাসতে ব'সে প'ড়ে বলল, "এই মাত্তর খোকাদের খাইয়ে এলুম। ওদের খাওয়াতে বড্ডো দেরি হয়ে গেল ভাই, তাই আজ আর আসতে পারিনি। যা সব দুষ্টু ছেলে!"

এ কি অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর! এ কি প্রশান্ত গভীর স্নেহ! সকলের মন যেন জুড়িয়ে গেল!

মেজ-বৌ এমন ক'রে কথাগুলি বলল, যেন তারই কোলের খোকাদের খাইয়ে দাইয়ে শান্ত ক'রে তবে আসতে পারল!

লতিফা কিছুতে বুঝতে পারল না। শুধু রুবির চোখ ফেটে জল এল! সে মনে মনে মেজ-বৌকে নমস্কার ক'রে বললে, "তোমার আর ভয় নেই। তুমি ভয়ের সাগর উতরে গেছ!"

লতিফা বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন ক'রে বসল, "কার খোকা মেজ-বৌ?"

রুবি জোরে লতিফার হাত টিপে দিতেই তার হুঁস হল। সে ভুলেই গেছিল, যে, আজ মেজ-বৌ তার খোকার নামে পাড়ার খোকাদের খাওয়ালে! তার এই অমার্জ্জনীয় ভুলের জন্য সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে। না জানি মেজ-বৌর শোকার্ত্ত মাতৃ-হৃদয়ে কত ব্যথাই সে দিয়েছে! তাড়াতাড়ি এদিক থেকে মন ফেরাবার জন্য সে বোকার মত ব'লে উঠল, "আজ দাদাভাইয়ের চিঠি পেলাম কি-না ভাই, তাই মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে! তাই হুঁস ছিল না!"

মেজ-বৌ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ওঁর খুব অসুখ বুঝি?"

লতিফা অবাক হয়ে ব'লে উঠল, "হাঁ, তা তুমি কি ক'রে জানলে?"

মেজ-বৌ হেসে বলল, "ভয় নেই, তিনি আমায় চিঠি দিয়ে জানাননি এমনি কেন যেন মনে হ'ল।"

রুবির চোখ নিমিষের তরে যেন জ্বলে উঠল। সে লতিফার কাছে শুনেছিল, মেজ-বৌর নাকি ওদিক দিয়ে একটা গোপন দুর্ব্বলতা আছে। কিন্তু সে শিক্ষিতা মেয়ে! কাজেই তার জ্ব'লে ওঠা চোখকে এক নিমিষে নিবিয়ে ফেলতে দেরি হ'ল না। তার ওপর শোকার্ত্ত মাতৃহৃদয়কে এদিক দিয়ে আঘাত করবার মত নির্ম্মমতাও তার ছিল না।

রুবি কিছু বলবার আগেই মেজ-বৌ ব'লে উঠল, "আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সকাল সন্ধ্যে একটু ক'রে পড়াব মনে করেছি, তা তুমি ত ভাই ম্যাজিষ্টরের মেয়ে, তোমার বাবাকে ব'লে এই পাড়াতেই একটা ছোট ঘর তুলে দিতে বল না। অবশ্য ঘর না পেলে আপাতত আমাকে আমাদের উঠোনের সামনে বাগানটাতেই পাঠশালা বসাতে হবে। কিন্তু বর্ষা এলে তখন কি করা যাবে?"

রুবির মনের ঝাঁঝটুকু কেটে গেল, এই হতভাগিনীর এই সান্ত্বনা খোঁজার ছল দেখে। তার বুঝতে বাকি রইল না যে, সকল ছেলেকে ভালোবেসে ও নিজের ছেলের শোক ভুলতে চায়। সে খুশি হয়ে বলল, "নিশ্চয়ই বলব আব্বাকে। আর তিনি যদি কিছু না-ই করেন, আমি তোমার পাঠশালার ঘর তুলে দেবো। শুধু ঘর তোলা নয়, নিজে এসে সাহায্যও ক'রে যাব হয়ত!"

মেজ-বৌ বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে না। কিন্তু তার চোখ জলে ভ'রে এল! সে একটু চুপ ক'রে থেকে দুই হাত তুলে ললাটে ঠেকালে। সে নমস্কার তার রুবিকে কি কাকে উদ্দেশ ক'রে বোঝা গেল না।

লতিফা বিস্ময় বিমূঢ়ের মত এতক্ষণ ব'সেই ছিল। ও যেন এর কিছুই বুঝতে পারছিল না। ওর মন ছিল ওর ঘর-ছাড়া দাদুটির

চিন্তায়—তার জন্য বেদনায় ভরপুর। মেজ-বৌ এসে পড়ার পর থেকে যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল রুবির সঙ্গে—তা এমন হঠাৎ চাপা পড়ল দেখে সে একটু ছটফট করতে লাগল—অবশ্য মনে মনে। তার ওপর, ছেলে মরার শোক ও জানে না, কিন্তু না জেনেই ওর ভীতু মন ও শোকের কথা ভাবতেও যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। ও শোকের যেন কল্পনাও করা যায় না। সে আর থাকতে না পেরে যেন এই শোকাবহ প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্যই ব'লে উঠল, "আচ্ছা, মেজ-বৌ! তুমি একটা বুদ্ধি বাতলে দিতে পার? অবশ্য তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়ার এ সময় নয়। তবু মনে হয়, তুমি যেন এর একটা মীমাংসা করতে পারবে।"

মেজ-বৌ নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে লতিফার দিকে চাইল।

লতিফা ব'লে যেতে লাগল, "আজ সকালে দাদাভাই-এর একখানা চিঠি পেয়েছি রেঙ্গুন জেল থেকে। সেই নিয়েই রুবির সঙ্গে আলোচনা চলছিল। যাক, চিঠিখানা তুমি দেখই না, তা হলে সব বুঝতে পারবে।"

মেজ-বৌ চিঠি নিয়ে পড়তে লাগল।—

রেঙ্গুন সেনট্রাল জেল

চিরআয়ুষ্মতীষু!

স্নেহের বুঁচি! পাঁচ-ছ মাস পরে তোদের চিঠি দিচ্ছি। সব কথা লিখতে পারব না—লিখবার অধিকার নেই। লিখলেও উপরওয়ালারা তাকে এমন ক'রে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবেন যে, স্যার জগদীশ বসুও কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার উদ্ধারসাধন করতে পারবেন না। তা ছাড়া, আমার স্বভাব ত জানিস, আমি ব'লে যেতেপারি অনর্গল, কিন্তু লিখতে হয় অর্গল-বদ্ধ হয়ে। তাতে ক'রে মন আর হাত দু-ই ওঠে হাঁপিয়ে।

অবশ্য হাঁপানি আমার এখনো আরম্ভ হয়নি—যদিও বুকে টিউবার্‌-কিউলসিসেব জার্ম্‌ কিছুদিন থেকে তার নীড় রচনা করেছে। সে খবর অনেক আগেই খবর কাগজের মারফতে হয়ত প্রচার হয়ে গেছে; এবং তোরও তা শুনতে বাকি নেই।

তুই ত শুধু আমার বোনই নস, তুই বন্ধু। তাই আজ তোকে এমন অনেক কথা বলব, যা তোর কাছেও কোনো দিন বলিনি।

তুই ত জানিস, আমার বুকে পোকার খাবার মত কোনো খাদ্য ছিল না। কিন্তু ওটা যে সংক্রামক, তাও আমার অজানা ছিল না। একদিন পোকা-খাওয়া বুকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। শুনলাম, সে পোকা নাকি আমারি কাঁটার বেড়ার থেকে উড়ে গিয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছে।

বড় দুঃখ হ'ল। কিন্তু আমার কোনো হাত ছিল না! থাকলেও সে হাত বন্ধক রেখেছিলাম পুলিশের হাত-কড়ার কাছে। কাজেই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ব'সে থাকতে হ'ল।

কিন্তু প্রভুভক্ত পোকা আমায় ভুলতে পারলে না। এত সি, আই, ডি, এত পুলিশ-প্রহরীর নজর এড়িয়ে—সমুদ্দুর ডিঙিয়ে আমার বেড়ার পোকা আমার বুকে ফিরে এল। অন্যের বুক কতটা খেয়ে এসেছে, তা তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা এবং সতেজ দংশন দেখেই বুঝতে পারলাম।

অবশ্য আমার আর কোন পোকাকেই ভয় নেই। বিলিতি পোকা, দিশি পোকা, বুকের পোকা, দুঃখের পোকা—তা সে যে পোকাই হোক। কিন্তু ভয় আমার না থাকলেও কর্তাদের আছে। তাঁরা

আমায় নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। সাপের ছুঁচো গেলা-গোছ—ছাড়তেও পারে না, গিলতেও পারে না।

আজ ঘুম থেকে উঠেই খোশ খবর শোনা গেল। আমায় নাকি কাল ছেড়ে দেওয়া হবে। অবশ্য ছেড়ে দেওয়া মানে, দম নিতে দেওয়া। মরিস যদি বাবা, ত ঘরে গিয়েই মর্, আমাদের দায়ী ক'রে যাসনে—এই মনোভাব আর কি!

এরা সত্যিই সিংহের জাত। পশু হ'লেও পশুরাজ স্পেসিসের। আধমরা রোগ-জীর্ণ শীকার এরা খায় না।

আবার পুরুষ্টু হয়ে উঠলেই কঁ্যাক ক'রে ধরবে!...

আমি ঠিক করেছি, ছাড়া পেলেই সোজা ওয়ালটেয়ারে ছুটে যাব। আমি চাই—এই বন্ধনের পরে নিঃসীম মুক্তি। মাথায় অনাবৃত আকাশ, চোখের সামনে কূলহারা তটহারা জলধি, মনের সামনে নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত একা—একা আমি!

মাঝে মাঝে মনে হয়—মনে হয় ঠিক না, লোভ হয়—যাবার আগে এই অদ্বিতীয় মনের দ্বিতীয় জনকে দেখে যাই—জেনে যাই। আমার মরুভূমির উর্দ্ধে সাদা মেঘের ছায়া নয়—কালো মেঘের ছায়া-ঘন মায়া দেখে যাই।

তোরই চিঠিতে জেনেছি, সে মেঘ নাকি তোরই দেশে গিয়ে জমেছে। তোর হাতের কাছে যদি খুব খানিকটা উত্তুরে হাওয়া থাকে, দিতে পারিস তাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে? তুই হয়ত বলবি, এবং শুনে মেঘও হয়ত বিদ্যুৎ হাসি হেসে বলবে, হাতের কাছে যার থাকবে সমুদ্দুর, সে চায় দু-ফোঁটা মেঘের জল! সংস্কৃত কবিদের একটা চির-চলিত

উপমার কথা মনে পড়ছিল, তা আর লিখলাম না। না লিখলেও বুঝবি ব'লে।

মানুষ যখন প্রগল্‌ভ হয়—অর্থাৎ সোজা কথায় বিকারগ্রস্থ হয়ে বকৃতে থাকে, তখন তার যে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে—এ কথা ডাক্তারে না বললেও সকলে বোঝে। আমার বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

আমার যাবার বেলায় আমার শেষ কথা ব'লে গেলাম এইজন্যে যে, বলবার অবসর জীবনে হয়ত আর হবে না।

আমি জীবনে কোনো কিছুতেই নিরাশ হইনি। জীবনের বেলাতেও হতাম না—যদি না বুঝতাম যে, বাঘে ধরেও যাকে উগলে দেয়—তার দুরবস্থা কত দূরে গিয়ে পৌঁচেছে! রক্তমাংসের পরিমাণ তার কত কমে এসেছে!—কিন্তু এ কি ক্ষুধা আমার? এই কি মৃত্যুক্ষুধা?

আমি যদি না-ই ফিরি, দুঃখ করিসনে ভাই। আমরা ত ফেরার সম্বল নিয়ে বেরোইনি। তাই ফেরারী আসামী হয়েই কাটিয়ে দিলাম। আমাদেরই পথের পথিক যারা র'য়ে গেল—তাদের মাঝেই আমায় দেখতে পাবি। এই কারায়, এই ফাঁসিমঞ্চে আমরা ত আজই এসে দাঁড়াইনি, আমাদের কণ্ঠে শত জন্মের শত লাঞ্ছনার রক্ত-লেখা হয়ত আজো মুছে যায়নি। নইলে এমন সুখের নীড়ে আমার মন বসল না কেন? পিঞ্জরের দ্বার ভেঙে মুক্ত লোকের ঊর্দ্ধে উড়ে গান গাওয়ার এ সাধ কেন জাগল? জীবনকে আমরা জীবিতের মতই ব্যয় ক'রে গেলাম, মৃতের মত কার্পণ্য ক'রে কাক-শকুনের খাদ্য করিনি! আমার যা সম্ভাবনা, তা যেন কোনো দিন তোর অগৌরবের না হয়ে ওঠে।

অন্য লোকে গিয়ে যদি এ লোকের প্রিয়জনকে মনে রাখবার মত অবসর থাকে, সেথা গিয়ে যদি অনশন কারাবন্দী না হই, তা হ'লে বিশ্বাস করিস—তুই আমার মনে থাকবি।

খোকাদের চুমু দিস। নাজির সাহেবকে ফাইন্যাল গুঁতো! তুই আদর-আশিস নে।

রুবি ও মেজ-বৌকে আমার নমস্কার জানাস। ইতি—

তোর—দাদু

চিঠি প'ড়ে মেজ-বৌ যে মুখ উর্ধ্বে তুলে ধরলে, তা মানুষের মুখ নয়। ও যেন ঝরার একটু আগের শিশির-সিক্ত রক্ত-কমল!

লতিফা মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগল। রুবির চোখ যেন পুড়ে গেল!

মেজ-বৌর কিছু বলবার আগেই রুবি ব'লে উঠল, "আমি ঠিক করেছি বুঁচি, আমি ওয়ালটেয়ারে যাব। মা আমায় বলেন উল্কা। উল্কাই যদি হই, তা হ'লে শূন্যে আর ঘুরতে পারিনে। ধরায় যে মানুষ আমায় নিরন্তর টানছে, মুখ থুবড়ে তার দেশেই পড়ব গিয়ে। হয়ত আর আমি মুখ তুলে উঠতে পারব না, আমার সব আগুনও যাবে নিবে। তবু ঐ আমার মহান মৃত্যু!—কি বল মেজ-বৌ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে? লুকিয়ে পালাতে হবে কিন্তু। অভিসারিকা সেজে, বুঝেছ?

রুবির চোখ যেন সোনার আংটিতে বসানো রুবির মতই জ্বলতে লাগল।

মেজ-বৌ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে ব'লে উঠল, "আমার যাবার

ইচ্ছা থাকলে তোমার বহু আগেই সেখানে গিয়ে উঠতাম ভাই রুবি বিবি। দু-মাস আগে এ খবর পেলে কি করতাম জানি না। কিন্তু আজ আর আমাকে নিয়ে আমার কোনো ভয় ডর নেই। খোকাকে যদি না হারাতাম, এই খোকাদের যদি না পেতাম, তা হ'লে আমি সব আগে গিয়ে তাঁকে সেবা ক'রে ধন্য হতাম।"

রুবি মেজ-বৌর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'লে উঠল, অর্থাৎ তুমি রুবি হ'লে এতক্ষণ বেরিয়ে পড়তে!"

মেজ-বৌ হেসে ফেলে বললে, "হু। তাই।" রুবি এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ভাই মেজ-বৌ, তুমি একটু আগে আমায় উদ্দেশ করেই বোধ হয় নমস্কার করেছিলে, আমার প্রতি-নমস্কার নাও। তুমিই আমায় পথ দেখালে।"

ব'লেই লতিফার দিকে চেয়ে বললে, 'ভাই বুঁচি, সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে! আমার পথের সন্ধান পেয়েছি। ভাই মেজ-বৌ, আমি বুঁচির কাছে পাঠিয়ে দেবো তোমার খোকাদের পাঠশালা তৈরীর খরচা—গ্রহণ ক'রো!"

মেজ-বৌ, লতিফা কিছু বলবার আগেই রুবির ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "শোফার! গাড়ী লে আও!"

(২৮)

ওয়ালটেয়ার

ভাই বুঁচি !

আমি যদি আজ আমার পরিচয় দিই—আমি তোদের সেই রুবি, তা হ'লে বিশ্বাস করবি ? আমার বাপ-মাও জানেন আর তোরাও হয়ত জানিস, আমি মরেছি। অথবা যদি না মরে থাকি, তা হ'লে আমার মরণই মঙ্গল বা একমাত্র গতি।

তোরা—অন্তত তুই শুনে সুখী হবি, না দুঃখিত হবি জানিনে, যদি আমি লিখি যে, আমি আজও মরিনি। আমি বেঁচে গেছি বুঁচি, বেঁচে গেছি—তোদের চেয়েও বড় ক'রে বেঁচে গেছি।

আজ তোকে সব কথা খুলে বলব, তারপর সামনে রয়েছে কুলহারা সমুদ্র। কুলহারা জীবনকে আর কেউ নিতে না পারে, সে ত রয়েছে !

তোর কাছে যখন জানলাম, তোর আনু ভাই রেঙ্গুন জেল থেকে—মৃত্যুর নোটিশ হাতে ওয়ালটেয়ারে যাচ্ছে, তখনই আমার কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে ফেললাম। তোর-কাছে-লেখা তার চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন আমার দিকে তাকিয়ে বলছিল, "তোমায় চায়, সে তোমায় চায় !" রাজার লাঞ্ছনা-তিলক তার কপালে, শ্যাম সমান মরণের বাঁশী তার হাতে, ঐ যে আমার রাজপুত্র ! আমি অভিসারে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি জানতাম, আমার বাপ-মার আদেশ অনুরোধ ও স্নেহের

বিপুল বাধাকে ডিঙিয়ে কিছুতেই বুঝি তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারব না। কিন্তু সে যখন তার মৃত্যু-মলিন চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকাল, তখন তার কাছে আমার সম্মুখের এত বড় বাধা যেন বাধা ব'লেই মনে হ'ল না।

মনে হ'ল এত বড় যে বাধা, এত বড় যে অন্তরায়—সে তার চেয়েও বড়, তার চেয়েও বিপুল! আকাশ আমায় ডাক দিল, আমার পাখা চঞ্চল হয়ে উঠল, আমি নীড়ের মায়া ভুললাম।

যে পর্ব্বতে জন্মগ্রহণ করেছি আমি স্রোতস্বিনী, তার এত পাথর এত বন জঙ্গল পথ আগলে আমায় ধ'রে রাখতে পারলে না, আমি সমুদ্রের উদ্দেশে ছুটে এলাম। সমুদ্রের নাগাল পেয়েছি, আজ আমার মনে হচ্ছে, এই আমার শেষ, এই আমার পরিণতি, এই আমার সার্থকতা! কূল হারিয়েই আমার অকূলের বন্ধুকে পেলাম।

আমার বাপ-মার মনে—তোদের মনে কত ব্যথা দিয়েছি জানি। তোরা পাহাড়ের মত সংস্কারের পর সংস্কারের পাথর চড়িয়ে উঁচু হয়ে আছিস, তোরা হয়ত তাকেই বলিস মহিমা। কিন্তু ঐ মহিমার অচলায়তনে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে বেঁচে থাকার মায়া অন্তত আমার ছিল না কোনোদিন। ও জীবন আমার নয়। নিজেকে হারিয়ে দেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়াই আমার জীবনের গতি। পথে চ'লে, ভুল ক'রে, পথ হারিয়েই আমার মুক্তি। জানি, ও জীবন আমার কাছে যেমন সত্য, তোদের কাছে তেমনি মিথ্যা।

আমার সত্যকে আমি চেয়েছি এবং পেয়েওছি, এই আমার সান্ত্বনা!...

একদিন অন্ধকার রাত্রে—যখন তোরা, আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই ঘুমুচ্ছিলি, আমি বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারের হাত ধ'রে। আলোর দেশে পৌঁছে দিয়ে আমার সাথী অন্ধকার চ'লে গেছে! আমি আলো পেয়েছি, বন্ধুকে পেয়েছি—আমাকে পেয়েছি।

তোর চেয়ে ত বড় আত্মীয় আনসারের কেউ নেই, কই, তুই ত এমন ক'রে আসতে পারলিনে!

আমি কে তার? দু-দিনের পরিচয়—কৈশোরের স্বপ্নে। কিন্তু সে স্বপ্নের নেশা আর আমার কাটল না। সেই স্বপ্নের পরিচয়কে সকলের মাঝে স্বীকার করার অবকাশ বিধাতা দিলেন না। আমাদের শুভদৃষ্টি হ'ল সকলের অন্তরালে—মৃত্যু আর সমুদ্রকে সাক্ষী ক'রে। আমাদের বাসর সাজাচ্ছে মৃত্যু তার অন্ধকারের নীল পুরীতে! বাইরে কেবল কোলাহল, কেবল লজ্জা, ভাল ক'রে চোখ চেয়ে বন্ধুকে দেখবার অবকাশ নেই। এইবার দেখব তাকে সেই বাসর ঘরে চোখ পু'রে প্রাণ পু'রে। রবি শশী গ্রহ তারার দল আমাদের বাসর ঘরে আজ থেকেই আড়ি পাতছে।....

এখানে এসে একদিন কাগজে দেখলাম, আমার বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আমি কি বুঝি না, কেন তিনি অবসর গ্রহণ করলেন—শুধু চাকরিতে নয়, হয়ত বা জীবনেও! সব বুঝি, তবু এর আর কোনো চারা ছিল না!

মনে করলাম, ভালই হ'ল এ। যে ক্ষমা এ জীবনে পাব না বাবার কাছে, সে ক্ষমা চেয়ে নেব এর পরের জীবনে। সেখানে সংস্কারের বন্ধন নেই, মহিমার উচ্চতা নেই, প্রেস্টিজের অভিমান নেই। মৃত্যুর

বাসর ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নেব, আমি জানি—সেদিন প্রাণ ভ'রে তিনি আশীর্ব্বাদ করবেন!

আর মা? আজ যদি যাই তাঁর কোলে ফিরে, আজও তিনি ধুলো মুছে তেমনি ক'রে বুকে তু'লে নেবেন। কিন্তু মা ত বাবাকে ছাড়িয়ে নেই। যে ক্ষমা বাবা এ জীবনে করতে পারবেন না, বুক ফেটে গেলেও না, মা সে ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করতে পারবেন না। তাঁরা রটিয়েছেন, মেয়ে ম'রে গেছে। সেইটেই সত্য হোক!

আমার জন্ত যে মিথ্যা কবর খোদাই হয়েছিল, সে শূন্য কবর শূন্য থাকবে না। আমি তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব—যত তাড়াতাড়ি পারি ম'রে তাঁদের সকল লজ্জার অন্ত করব।

অবশ্য আত্মহত্যা ক'রে নয়! এ ভীরুতা আমার মনে কোনো দিনই নেই। থাকলে অনেক আগেই মরতে পারতাম—অন্তত সেই দিন, যেদিন আমার অমতে আমাকে বিয়ের ছুরিতে গলা রাখতে হয়েছিল।

এ ত গেল আমার দুঃখের কাহিনী। এইবার আমার সুখের কথা শুনবি?

আমি যখন ওয়ালটেয়ারে এসে নামলাম, দেখি আনসারের রাজ-বন্ধু পুলিশের গুপ্তচররা আমায় ছেয়ে ফেলেছে। আমার শাপে বর হ'ল। কত সন্ধান ক'রে তবে হয়ত তাকে বের করতে হ'ত। তাদের কাছেই সন্ধান পেলাম, অবশ্য আমার জিনিষপত্র সন্ধান করতে দেওয়ার বিনিময়ে।

তখনো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসেনি। তার শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি ছোট্ট ঘরে অবস ভাবে হাত দুটি এলিয়ে দিয়ে সে সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে আছে।

আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছিলাম জুতা খুলে। দেবতার ঘরে কি জুতা প'রে ঢুকতে আছে?

দেখলাম, বেলাশেষে পূরবী রাগিণীর মত তার চোখে মুখে কান্না আর ক্লান্তি। বাতায়ন-পথে সন্ধ্যাতারার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। সে নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারাকে নমস্কার করলে। আমি অমনি ঘরে ঢু'কে বললাম, "আমি এসেছি।"

সে কী আনন্দ তার চোখে মুখে! সে "কবি" ব'লে ডেকেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল!...

আচ্ছা বুঁচি, তুই ঘুমন্ত ক্ষুধাতুর অজগরের জাগরণ দেখেছিস? শিউরে উঠিসনে। সব কথা ভাল ক'রে শোন্।

দু'-দিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে। ওর সে বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি বন-হরিণীর?

সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল। আমি কাঁদতে লাগলাম, আমার জন্য নয়—ওর জন্য। এ সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শুধু আমার মৃত্যু নয়—এ যে ওরও মৃত্যু! ও যে ওর মৃত্যু-জরজর, আমাকে গ্রাস ক'রে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কি আজ আর ওর আছে?

আমি জানতাম, এ রোগের বড় শত্রু ঐ প্রবৃত্তি! নইলে, যে আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর, তাকে এ মৃত্যু-ক্ষুধায় পেয়ে বসল কেন?

সে যখন বলল, "কবি, চিরদিন বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ মৃত্যুর ক্ষণে তুমি অমৃত পরিবেশন কর। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই।"

আমি আমার উপবাসী ভিখারী বন্ধুকে ফেরাতে পারলাম না।

তবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওকে কি বাঁচাতে পারবেন বলে মনে হয়?"

ডাক্তার বলল, "ওঁর এক ধারের ফুসফুস খেয়ে ফেলেছে। আর এক ধারও আক্রমণ করছে। ও রোগ এখন আমাদের চিকিৎসার শক্তিকে অতিক্রম ক'রে গেছে! এখন ওঁকে যদি বিধাতা বাঁচান!"

আমি ডাক্তারকে নমস্কার ক'রে বললাম, "তা হ'লে আপনার আর কষ্ট ক'রে আসবার দরকার নেই ডাক্তার সাহেব। ও শান্তিতে মরুক!"

ডাক্তার চ'লে গেল। আমিও আমার কর্ত্তব্য বেছে নিলাম।

আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত-মুখে আত্ম-সমর্পণ করলাম! যদি ও না-ই বাঁচে, তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দেব না! দু-দিন আগে মরবে এই ত! তা ছাড়া, এ মৃত্যু ত ওর একার নয়, ওর বুকের মৃত্যু-বীজাণু আমাকেও ত আক্রমণ করবে!

সে কি তৃপ্তি, সে কি আনন্দ ওর! মরুপথের পথিক মরবার আগে যেন মরুদ্যানে ছায়া পেল।

ওর আনন্দ, ওর হাসি, ওর সুখ দেখে মনে হ'ল, ও বুঝি বেঁচে গেল! বিষই বুঝি ওর বিষের ওষুধ হ'ল!

কিন্তু—কিন্তু—বুঁচি! লতি! সই! আজ আমার ঘরের প্রদীপ নিবে আসছে! তার শিখা কাঁপছে! মরণের ঝড় আমার ঘরে ঢুকে মাতামাতি করছে। আমি আমার এইটুকু আঁচলের আড়াল দিয়ে ওঁকে বাঁচাই কি ক'রে ভাই?

কে জানত, ওর ঐ হাসি, ঐ আনন্দ—নিববার আগে শেষ জ্বলে ওঠা!

চিঠি লিখতে লিখতে ভোর হয়ে এল। তারই শিয়রে ব'সে এই চিঠি লিখছি। আমাদের শিয়রের বাতি নিবে আসছে। সে একদৃষ্টে ভোরের তারার দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে কাল থেকেই। কাউকে আমি ডাকিনি। সেও ডাকেনি।

দুইজনে সারারাত সমুদ্র আর আকাশের তারা দেখেছি।

একবার শুধু অতিকষ্টে বলেছিল, "ঐ তারার দেশে যাবে?"

আমি বললাম, "যাব!" সে গভীর তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বললে, "তা হ'লে এস, আমি তোমার আশায় দাঁড়িয়ে থাকব!"

তারপর আমায় চুমু খেলে।

এক ঝলক রক্ত উঠে এল! তার বুকের রক্তে আমার মুখ ঠোঁট রাঙা হয়ে গেল!

আশীর্ব্বাদ করিস, এই রক্ত-লেখা যেন আর না মোছে!...

তোর কাছে যখন এই লিপি গিয়ে পৌঁছবে—ততক্ষণে আমার দীপ নিবে যাবে! আমার সুন্দর পৃথিবী—আমার চোখে মলিন হয়ে উঠেছে! আমার চোখের নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে!

আমি জানি, আমারও দিন শেষ হয়ে এল! আমিও বেলাশেষের পূরবীর কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যু-বীজাণু নীড় রচনা করেছে! আমার যেটুকু জীবন বাকি আছে তা খেতে তাদের আর বেশি দিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চিরমিলন—নতুন জীবনে—নতুন—তারায়—নতুন দেশে—নতুন প্রেম!

তোদের সকলের জন্যে সে কেঁদেছে। কত বড়, কত বিপুল জীবন নিয়ে সে জন্মেছিল—আর কি দুঃখ নিয়েই না গেল! রাজার ঐশ্বর্য্য

মৃত্যু-ক্ষুধা

নিয়ে যে এসেছিল—সে গেল ভিখারীর মত,—নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বন্ধু—একা।

সে বলে গেছে, মৃত্যুর পর তার দেহ মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে। সমুদ্রকে সে ভালবেসেছিল—বুঝি বা আমার চেয়েও। সাগরের মত প্রাণ যার—তাকে সাগরের জলেই ভাসিয়ে দেব।

আর আমার সময় নেই! আমারও প্রদীপ নিবে এল বলে।

—রুবি

—সমাপ্ত—